বাংলা জাতীয় মাসিক

পরওয়ানা

www.parwana.net

জানুয়ারি ◆ ২০২১

আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)'র

আত্‌তানভীর

[তাফসীরুল কুরআন]

নিয়মিত

◆ জীবন জিজ্ঞাসা ◆ একনজরে গত মাস
◆ বিজ্ঞান ◆ জানার আছে অনেক কিছু
◆ ক্যারিয়ার ◆ আবাবীল ফৌজ
◆ কবিতা ◆ চিঠিপত্র

এ সংখ্যায় রয়েছে...

আল্লামা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী'র বিশেষ নিবন্ধ

আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা.)

যার কীর্তি, যার স্মৃতি চির ভাস্বর

ব্যভিচার ও ধর্ষণ: সমাধান কোন পথে?

ধর্মের অবমাননায় মুসলিমদের প্রতিক্রিয়া কেমন হওয়া উচিত?

আচার-আচরণ ও মানবিক মূল্যবোধ

ইমাম গাযালী: ইসলামের প্রতিরক্ষা দেয়াল

জো বাইডেন: কেমন হবে মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক

উজবেকিস্তানে ওলী-আউলিয়ার পাশে

করোনা ভ্যাকসিন

বাংলা জাতীয় মাসিক
পরওয়ানা

২৮তম বর্ষ ■ ১ম সংখ্যা
জানুয়ারি ২০২১ ♦ পৌষ-মাঘ ১৪২৭ ♦ জমা. আউ.-জমা. সানী ১৪৪২

পৃষ্ঠপোষক
মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
আহমদ হাসান চৌধুরী

সম্পাদক
রেদওয়ান আহমদ চৌধুরী

সহকারী সম্পাদক
আখতার হোসাইন জাহেদ

নিয়মিত লেখক
আবু নছর মোহাম্মদ কুতুবুজ্জামান
রহমান মোখলেস
মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান
মারজান আহমদ চৌধুরী

সহ-সম্পাদক
মুহাম্মদ উসমান গণি
মোহাম্মদ কামরুজ্জামান

সার্কুলেশন ম্যানেজার
এস এম মনোয়ার হোসেন

কম্পোজ ও প্রচ্ছদ ডিজাইন
পরওয়ানা গ্রাফিক্স

যোগাযোগ
সম্পাদক, মাসিক পরওয়ানা
বি.এন টাওয়ার (৯ম তলা)
২৮/১ বি, দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল
ঢাকা-১০০০
মোবাইল: ০১৭৯৩ ৮৭৭৭৮৮

সিলেট অফিস
পরওয়ানা ভবন
৭৪, শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ
সোবহানীঘাট, সিলেট।
মোবাইল: ০১৭৯৯ ৬২৯০৯০

parwanabd@gmail.com
www.parwana.net

মূল্য: ২৫ টাকা

সূচিপত্র

তাফসীরুল কুরআন
আত-তানভীর/আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ্ (র.)
অনুবাদ: মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী ০৩

বিশেষ নিবন্ধ
গরীব, অন্ধ ও আতুর প্রকল্প : কিছু অনুভূতি/মাওলানা মো. ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী ০৫

দারসুল হাদীস
নিয়তের গুরুত্ব/মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান ০৭

সাহাবা
আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা.)/মাওলানা মো. নজমুদ্দীন চৌধুরী ০৯

স্মরণ
ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) যার কীর্তি, যার স্মৃতি চির ভাস্বর/রূহুল আমীন খান ১১

ফিকহ
ফিকহ ও হানাফী মাযহাবের ভিত্তিমূল/মো. মুহিবুর রহমান ১৪

প্রবন্ধ
ধর্মের অবমাননায় মুসলিমদের প্রতিক্রিয়া কেমন হওয়া উচিত?/মাবরুর মাহমুদ ১৬
ব্যভিচার ও ধর্ষণ: সমাধান কোন পথে?/মোস্তফা মনজুর ১৮
আচার-আচরণ ও মানবিক মূল্যবোধ/আফতাব চৌধুরী ২১
থার্টি ফার্স্ট নাইট উদযাপন বিজাতীয় সংস্কৃতি/মুহাম্মদ মাহমুদুল হাসান ২২

মনীষী
ইমাম গাযালী: ইসলামের প্রতিরক্ষা দেয়াল/মো. ফরিদ উদ্দীন ২৩
মধ্যযুগে মুসলিম বিজ্ঞানী/আহসান হাবীব ২৫

আন্তর্জাতিক
জো বাইডেন: কেমন হবে মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক/রহমান মোখলেস ২৭
আজারবাইজান-আর্মেনিয়ার কারাবাখ চুক্তি: তুরস্কের ভূমিকা ও অর্জন ২৯

সফরনামা
উজবেকিস্তানে ওলী-আউলিয়ার পাশে/মারজান আহমদ চৌধুরী ৩০

অনুভূতি
আয়া সোফিয়ার ইতিহাস ও সতেজ অনুভূতি/মাহফুজ আল মাদানী ৩৩

খাতুন
খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতিমা (রা.)/মাওলানা জিয়াউল হক চৌধুরী ৩৫

গ্রন্থ পরিচিতি
কবি ফররুখ আহমদের 'সাত সাগরের মাঝি'/মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম ৩৮

স্বাস্থ্য
করোনা ভ্যাকসিন/মুমিনুল ইসলাম ৩৯

নিয়মিত
জীবন জিজ্ঞাসা ৪০
একনজরে গত মাস ৪৮
বিজ্ঞান ৪৯
জানার আছে অনেক কিছু ৫০
ক্যারিয়ার ৫১
কবিতা ৫২
আবাবীল ফৌজ ৫৩
চিঠিপত্র ৬০

সম্পাদকীয় ০২

সম্পাদক কর্তৃক বি.এন টাওয়ার (৯ম তলা), ২৮/১ বি, দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল ঢাকা-১০০০ হতে প্রকাশিত এবং সানজানা প্রিন্টার্স, ৮১/১, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০ হতে মুদ্রিত।

পরওয়ানা কেবল একটি মাসিক পত্রিকার নামই নয় বরং ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুনের একটি মুখপত্র এবং একইসঙ্গে ধর্মীয় মূল্যবোধের বাহকও। যামানার মুজাদ্দিদ শামসুল উলামা হযরত আল্লামা আবদুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) এর পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৯২ সালে জাতীয় এই মাসিক পত্রিকাটি নিবন্ধিত হয়ে প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ নির্দেশনা, নেক দুআ সর্বোপরি আল্লাহর রহমতে অল্পদিনেই পরওয়ানা অনন্য বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। আগামী ১৫ জানুয়ারি হযরত ফুলতলী ছাহেব (র.) এর ১৩তম ইন্তিকাল বার্ষিকী। নিকট অতীতের যেসকল ওলী-বুযুর্গ ইসলামের খিদমাতে অসামান্য অবদান রেখেছেন তাদের অন্যতম ছিলেন তিনি। ইলমে কিরাত, ইলমে হাদীস, ইলমে তাসাওউফ ও খিদমাতে খালকে তাঁর অবদান বিশ্বময় নন্দিত। মহান আল্লাহ তাআলার দরবারে তাঁর দরজা বুলন্দি কামনা করছি।

মাসিক পরওয়ানা অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ সম্পাদক মাওলানা হুছামুদ্দীন চৌধুরী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত; তাঁরই অক্লান্ত পরিশ্রম, সুদক্ষ সম্পাদনা ও মেধার প্রতিফলনে বিষয়-বৈচিত্রে সমৃদ্ধ পত্রিকাটি দেশ-বিদেশের বাংলাভাষী পাঠকের কাছে শুরু থেকেই বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। সময়োপযোগী, বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্যসমৃদ্ধ গবেষণামূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ লেখালেখিই পরওয়ানাকে বিপুল সংখ্যক পাঠকের আকাঙ্ক্ষিত জাতীয় মাসিকের মর্যাদা দিয়েছে। সম্পাদক মহোদয়ের দ্বীনি ও মানবকল্যাণমূলক কাজের ব্যস্ততায় কিছুকাল থেকে পত্রিকাটি অনিয়মিত হয়ে পড়ে। আমাদের অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতার ঘাটতি থাকলেও পূর্বসূরিদের পরামর্শ ও পৃষ্ঠপোষকতায় জানুয়ারি, ২০২১ থেকে পরওয়ানা নিয়মিত প্রকাশ হচ্ছে, ইনশা-আল্লাহ।

...

তথ্য-প্রযুক্তির কল্যাণে বৈশ্বিক গ্রামে পরিণত হওয়া পৃথিবী ২০২০ সালে এসে ভিন্নরূপ ধারণ করেছে। চীনের উহান নগরী থেকে ছড়িয়ে-পড়া করোনাভাইরাস শুধু দেশ থেকে দেশ কিংবা নগর থেকে নগরকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে এমন নয় বরং সামাজিক দূরত্ব নামক একটি নতুন ধারণার জন্ম দিয়েছে, যা সমাজবদ্ধ মানুষের জন্য মেনে নেওয়া কষ্টকর। ইতোমধ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা রোগটিকে একটি বৈশ্বিক মহামারী হিসেবে গণ্য করেছে। আবহাওয়ার পরিবর্তন অথবা সময়ের ব্যবধানে ভাইরাসটি দুর্বল হওয়ার আশা ভঙ্গ হওয়ায় বিশ্ববাসীর চোখ এখন টিকার দিকে। আশার কথা হল বেশ কয়েকটি টিকা ইতোমধ্যে চূড়ান্ত ট্রায়ালে উত্তীর্ণও হয়েছে। বিশ্বখ্যাত ওষুধ কোম্পানি ফাইজার ও জার্মানভিত্তিক বায়োনটেক কোম্পানি এক্ষেত্রে পথিকৃৎ। তুরস্ক বংশোদ্ভূত জার্মান মুসলিম দম্পতি উগার শাহিন ও ওজলেম তুরেসি টিকাটি আবিষ্কার করেন। যদিও রোগের ধরন পরিবর্তন ও স্বল্প সময়ের ট্রায়ালে টিকার সফলতার নিশ্চয়তা দেওয়া যাচ্ছে না। তবে মানবজাতি করোনা-পরবর্তী স্বস্তিদায়ক এক পৃথিবীর জন্য উন্মুখ। মৃত্যুর বাস্তবতাকে করোনা মানবচিন্তার কেন্দ্রস্থলে নিয়ে এলেও আগামীর পৃথিবী কি এর সুফল ভোগ করবে? অন্যায়, পাপাচার, যুলুম, অবিচার এবং চূড়ান্ত ভোগবাদী চিন্তা থেকে কি সরে আসবে মানুষ? হয়তো করোনা এ প্রশ্নের জবাবের জন্যই অপেক্ষা করছে। আবারও পৃথিবীতে ফিরে আসুক সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধি ও স্বাভাবিক পরিবেশ–মানবিক পরিবেশ।

অন্যায়, পাপাচার, যুলুম, অবিচার এবং চূড়ান্ত ভোগবাদী চিন্তা থেকে কি সরে আসবে মানুষ? হয়তো করোনা এ প্রশ্নের জবাবের জন্যই অপেক্ষা করছে। আবারও পৃথিবীতে ফিরে আসুক সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধি ও স্বাভাবিক পরিবেশ–মানবিক পরিবেশ।

...

স্বপ্নের পদ্মা সেতুর সর্বশেষ স্প্যানটি বসানোর মধ্য দিয়ে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে সারা দেশের সরাসরি সংযোগ স্থাপিত হলো। যানবাহন ও রেলগাড়ি চলাচলের জন্য স্প্যানের ওপর কংক্রিটের স্ল্যাব এবং এর উপর পিচ ঢালাই হবে, যা আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন হওয়ার কথা রয়েছে। এ সেতু চালু হলে সামগ্রিকভাবে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য তথা অর্থনীতির বিস্তার হবে, সর্বস্তরের জনগণ এর সুফল ভোগ করবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

আত্‌-তানভীর

আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)

অনুবাদঃ মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

তাফসীরঃ আরবী ভাষায় যে সকল হরফ রয়েছে ب (বা) তার মধ্যে হচ্ছে বিনম্র হরফ, যা দ্বারা নম্রতা প্রকাশ করা হয়। এ জন্য এ হরফ দ্বারা কুরআন শরীফ শুরু করা হয়েছে। 'বা' হরফ الله নামের সাথে মিলে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বাণী, من تواضع لله رفعه الله -যে আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে নম্রতা প্রকাশ করবে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে উচ্চ আসনে আসীন করবেন। এভাবে জুদী পাহাড়ে হযরত নূহ (আ.) এর নৌকা স্থির হওয়া, জাবালে রাহমাতে হযরত আদম (আ.) এর তাওবা কবূল হওয়া এবং মক্কা শরীফে কাবাগৃহ স্থাপন- এসব আল্লাহ তাআলার দয়া এবং মেহেরবানী ছিল। কারণ এখানে একই ধরনের নম্রতা বিদ্যমান ছিল।

الله শব্দটি اسم غير مشتق অর্থাৎ যার থেকে আর কোনো শব্দ বের হয় না। এ শব্দটি আল্লাহ তাআলার সত্তার জন্য নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত, এ শব্দ আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয় না, যেমন الله শব্দ হয়ে থাকে।

الرحمن শব্দটি দুনিয়া এবং আখিরাতের জন্য ব্যবহার করা হয়। الرحيم শুধু আখিরাতের জন্য ব্যবহৃত হয়। এ জন্য বলা হয়, رَحْمٰنُ الدُّنْيَا وَرَحِيْمُ الْاٰخِرَةِ

হযরত ইকরামা বলেন, رَحْمٰن একটি রহমতের সমন্বয় এবং رحيم একশত রহমতের সমন্বয়। যেমন আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেন, আল্লাহ তাআলার একশত রহমতের মধ্যে একটি রহমত দুনিয়াবাসীকে প্রদান করেছেন এবং অবশিষ্ট নিরানব্বইটি রহমত নিজের জন্য রেখেছেন। তা দিয়ে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাকে রহম করবেন।

বিসমিল্লাহ এর ফযীলতঃ সকল ইলম বা জ্ঞান রয়েছে আসমানী চার কিতাবে। আর এই চার কিতাবের ইলম একত্রিত হয়েছে কুরআনে পাকে। কুরআনে পাকের সমস্ত জ্ঞান রয়েছে সূরা ফাতিহার মধ্যে এবং সূরা ফাতিহার সমস্ত ইলম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম এর মধ্যে নিহিত। এ আয়াতের সমস্ত ইলম বিসমিল্লাহ এর 'ب' এর মধ্যে নিহিত। কেননা সমস্ত ইলমের মূল উদ্দেশ্য এবং ভিত্তি হচ্ছে- রবের সান্নিধ্য লাভ করা এবং এ 'ب' الإلصاق (মিলিত হওয়া) অর্থে এসেছে। সুতরাং ب বান্দাহকে রব পর্যন্ত পৌছায়। রবের সান্নিধ্য লাভই হচ্ছে বান্দাহর অন্তিম বাসনা।

হযরত ইমাম নিশাপুরী বলেন, একদা হযরত মূসা (আ.) অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এবং পেটের মধ্যে কঠিন ব্যথা হয়েছিল। রোগমুক্তির জন্য তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে এক ময়দানের একটি ঘাসের কথা বলে দেন। তিনি তা খেয়ে আল্লাহ তাআলার হুকুমে ভালো হন। তারপর দ্বিতীয়বার তাঁর এ অসুখ হয়েছিল। তিনি ঐ ঘাস খেলেন, কিন্তু অসুখ তো সারেনি বরং অসুখ আরও বেড়ে গেল। তারপর তিনি বলেন, হে আল্লাহ! আমি এ ঘাস প্রথমবার খেয়েছিলাম, তাতে আপনি ভালো করে দিয়েছিলেন; কিন্তু দ্বিতীয়বার খাওয়াতে আমার ক্ষতি হয়ে গেল। আল্লাহ তাআলা উত্তর দিলেন, হে মূসা! তুমি প্রথমবার আমার নির্দেশে ঘাসের কাছে গিয়েছিলে, তাই তুমি ভালো হয়েছিলে, কিন্তু দ্বিতীয়বার নিজেই গিয়েছ, তাই অসুখ বেড়ে গেছে। তুমি কী জানো না, দুনিয়াতে যা আছে, সবই বিষ, কিন্তু এর প্রতিষেধক হচ্ছে আমার নাম, অর্থাৎ আমার নাম নিয়ে খেলে বিষ পানি হয়ে যায়।

আরো একটি ঘটনাঃ হযরত রাবিয়া (র.) এক রাতে তাহাজ্জুদ এবং নফল নামাযে কাটাচ্ছিলেন। যখন সকাল হলো, তখন ঘুমিয়ে পড়লেন। তাঁর ঘরে একটি চোর প্রবেশ করল এবং তাঁর কাপড় নিয়ে দরজা দিয়ে বের হতে চেষ্টা করল; কিন্তু রাস্তা পেল না। তারপর কাপড় রেখে দিল, এতে সে দরজার সন্ধান পেল। এভাবে তিন বার করল। সে সময় ঘরের কোণ থেকে একটি আওয়াজ আসল। চুরি করা মাল রেখে বের হয়ে যা। যদিও বন্ধু ঘুমিয়ে গেছেন কিন্তু বাদশাহ জাগ্রত আছেন।

আরো একটি ঘটনাঃ আল্লাহর এক ওলী ছাগল চরাতেন। তাঁর ছাগলের কাছে বাঘ আসত, কিন্তু ছাগলের কোনো ক্ষতি করত না। একদিন এক লোক ঐ ছাগলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ অবস্থা দেখে তিনি বললেন, কখন থেকে বাঘ এবং ছাগলের মধ্যে সন্ধি হয়েছে। রাখাল জবাব দিলেন, যখন থেকেই রাখাল আল্লাহ তাআলার সাথে সন্ধি করেছে।

বর্ণিত আছে, ফিরাউন খোদায়ী দাবি করার আগে নির্দেশ দিয়েছিল, তার দরজার বাইরে যেন بسم الله 'বিসমিল্লাহ' লেখা হয়। যখন খোদায়ী দাবি করল এবং হযরত মূসা (আ.) কে তার নিকট প্রেরণ করা হলো এবং তাকে আল্লাহ তাআলার একত্বের দাওয়াত দেওয়া হলো, তখন ফিরাউনের মধ্যে হিদায়াতের কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। হযরত মূসা (আ.) বললেন, হে আল্লাহ! আমি কতদিন পর্যন্ত তাকে দাওয়াত দিতে থাকব? অথচ আমি তার মধ্যে কোনো ভালো লক্ষণ দেখছি না। তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, হে মূসা! সম্ভবত, তুমি ফিরাউনের ধ্বংস চাচ্ছ এবং তার কুফরের প্রতিই লক্ষ্য করছ, অথচ আমি তার দরজায় যা লেখা আছে এর প্রতি লক্ষ্য করছি।

দরজার বাইরে বিসমিল্লাহ লেখার কারণে যখন এক কাফির ধ্বংস থেকে রক্ষা পেয়ে গেল, তখন যে লোক জীবনের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত নিজের অন্তরে আল্লাহ তাআলার কালিমা লিখে রেখেছে, তাঁর অবস্থা কী হবে? যখন আল্লাহ তাআলা নিজের নাম রাহমান এবং রাহীম রেখেছেন, সে ক্ষেত্রে আমরা কেন রহম পাব না।

গোলাম কোনো জিনিস ক্রয় করলে, তা জানোয়ার হোক বা উপভোগ্য কোনো জিনিস হোক, সেক্ষেত্রে তার উপর বাদশাহের প্রতীক বা মোহর লাগিয়ে দেওয়া হয়, যেন শত্রুরা তাতে লোভ না করে। তেমনি আল্লাহ তাআলা বলেন, হে আমার গোলাম! শয়তান তোমার দুশমন। তুমি যখন কোনো কাজ বা ইবাদত শুরু করবে, তখন তুমি এর উপর আমার নামের নিশান লাগিয়ে দিবে। আর বলবে, بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হযরত নূহ (আ.) যখন নৌকার উপর সাওয়ার হলেন তখন بِسْمِ اللهِ

مَجْرٰهَا وَمُرْسٰهَا এ অর্ধ কালিমা পাঠ করেই মুক্তি পেয়ে গেলেন। যে ব্যক্তি সারা জীবন এ কালিমার অনুশীলন করতে থাকে, সে নাজাত থেকে বঞ্চিত হবে কেন?

উল্লেখ্য, মানুষ তিন ধরনের হয়ে থাকে।

১. سابق بالخيرات অর্থাৎ যারা কল্যাণের দ্বারা আগের সারিতে স্থান করে নেয়।
২. مقتصد ন্যায়পরায়ণ, যে ন্যায়-নীতি মেনে চলে।
৩. নিজের উপর নিজে অত্যাচার করে। নিজের খারাপ নিজেই করে বসে।

প্রথম প্রকারের লোকদের জন্য- তিনি আল্লাহ, দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ ন্যায়পরায়ণ লোকদের জন্য তিনি রহমান আর তৃতীয় প্রকার লোকের জন্য তিনি রাহীম। আল্লাহ الرحيم এর গুণে মানুষের ত্রুটি প্রকাশ না করে বরং লুকিয়ে রাখেন। মানুষ নিজের ক্ষতি নিজে এত বেশি করে, নিজের পিতাও যদি তা জানত তাকে ছেড়ে চলে যেত, নিজের সহধর্মিনী যদি জানত তাহলে সেও তাকে ছেড়ে চলে যেত, প্রতিবেশি যদি জানত, তবে তার ঘর বাড়ি ধ্বংস করে দিত।

আল্লাহ তাআলার اَللّٰهُ নামের বরকতে মানুষ তাঁর বন্ধুত্ব লাভ করতে পারে। যেমন- আল্লাহ তাআলা বলেন, اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

রাহমান নামের কারণে তাঁর মুহব্বতের দাবি করা যায় যেমন আল্লাহ বলেন, اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا

-"অবশ্যই যারা ঈমান আনে, নেক কাজ করে, শীঘ্রই রাহমান তাদের জন্য মহব্বতকারী নির্ধারণ করে দিবেন।" (সূরা মারইয়াম: ৮৯)

رحيم (রাহীম) নামের কারণে তিনি তার রাহমাত প্রবাহিত করেন। যেমন আল্লাহ বলেন, وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا

আল্লাহ তাআলা বান্দাদের জন্য ছয়টি জায়গায় রাহীম। যথা:

১. কবর ও কবরের ভিতর যে ভয়ঙ্কর দৃশ্যের অবতারণা হবে তা থেকে রক্ষার ক্ষেত্রে। ২. কিয়ামতের অন্ধকারের সময়। ৩. আমলনামা পাঠ করার সময়। ৪. পুলসিরাত পার হওয়ার সময় যে ভীতির সঞ্চার হবে, তখন। ৫. দুযখ ও এর শাস্তির সময়। ৬. জান্নাত ও এর শ্রেণি প্রদানের সময়।

হযরত ঈসা (আ.) একটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি দেখলেন আযাবের ফিরিশতারা ঐ মৃত ব্যক্তিকে আযাব দিচ্ছেন। তিনি নিজের কাজ শেষ করে ফেরার পথে আবার ঐ কবরের পাশ দিয়ে আসলেন। তখন দেখলেন, ঐ কবরে রাহমাতের ফিরিশতা নিয়োজিত হয়েছেন আর ঐ কবর নূরে পূর্ণ হয়ে গেছে। এতে তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তারপর তিনি নামায আদায় করলেন এবং আল্লাহ তাআলার নিকট দুআ করলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর নিকট ওহী পাঠালেন, হে ঈসা! এ বান্দা গোনাহগার ছিল, আর মৃত্যুকালে তার স্ত্রীকে অন্তঃসত্ত্বা রেখে এসেছিল। তার স্ত্রীর একটা ছেলে হয়, সে তাকে লালন পালন করে বড় করল। এরপর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সোপর্দ করল। এ বাচ্চাকে শিক্ষক بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ শিক্ষা দিলেন। এতে আমার লজ্জা এসে গেল, আমার বান্দাকে যমীনের পেটের ভিতর আগুনের শাস্তি দেওয়া হবে, অথচ তার ছেলে যমীনের পিঠে আমার নাম স্মরণ করছে।

আল্লাহ তাআলার এক ওলী এক টুকরো কাগজে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ লিখে ওসীয়ত করে গেলেন, এটা যেন তার কাফনের সাথে দেওয়া হয়। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি উত্তর দিলেন, আমি কিয়ামতের দিন বলব- ইলাহী, আপনি কিতাব পাঠিয়েছিলেন, আর এ কিতাবের শিরোনাম ছিলো بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ। আপনি কিতাবের শিরোনাম অনুসারে আমার সাথে ব্যবহার করুন।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ এ উনিশটি হরফ রয়েছে। আর দুযখের রক্ষক হচ্ছেন উনিশ জন। আল্লাহ তাআলা এ উনিশটি অক্ষরের বিনিময়ে উনিশজন রক্ষকের পরীক্ষা থেকে রক্ষা করবেন।

দিন-রাত চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে পাঁচ ঘন্টার জন্যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়েছে, আর বাকী উনিশ ঘন্টা খালি রয়ে গেছে। যে সময়ের মধ্যে বান্দা আল্লাহ তাআলার স্মরণে ডুবে থাকতে পারে না। এ উনিশ হরফ উনিশ ঘন্টা গোনাহের কাফফারা বা পরিপূরক।

সূরা তাওবায় যুদ্ধ বিগ্রহ হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে উল্লেখ থাকার কারণে সূরার শুরুতে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ লেখা হয়নি। তাছাড়া যবেহ করার সময় بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বলা কর্তব্য, কিন্তু بسم الله الله اكبر বলতে বলা হয় না। যখন আল্লাহ তাআলা ফরয নামাযের মধ্যে দৈনিক সতেরো বার এ কালিমা পাঠ করার তাওফীক দিয়েছেন। এতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, বান্দাকে শাস্তি দেওয়ার জন্যে সৃষ্টি করা হয়নি বরং রহমত এবং সাওয়াব প্রদানের জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ লেখা আছে এমন কোনো কাগজ যমীন থেকে উঠাবেন, আল্লাহ তাআলা তাঁকে সিদ্দীকীনের অন্তর্ভুক্ত করবেন। তার পিতা-মাতার উপর থেকে আযাব হ্রাস করা হবে, যদিও বা তারা মুশরিক হয়।

হযরত আলী (আ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ আয়াত নাযিল হলো, তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, প্রথমে যখন এ আয়াত হযরত আদম (আ.) এর উপর অবতীর্ণ হয়, তখন আদম (আ.) বলেন, আমার সন্তানগণ এ কালিমার ওসীলায় আযাব থেকে রক্ষা পাবে, যতক্ষণ তা পড়তে থাকবে। এরপর আল্লাহ এ আয়াত উঠিয়ে নিলেন। এরপর হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর উপর অবতীর্ণ করেন। হযরত ইব্রাহীম (আ.) তা অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে পাঠ করলে আল্লাহ তাআলা অগ্নি শীতল করে দেন। তারপর আবার এ আয়াত উঠিয়ে নিলেন। তারপর হযরত সুলাইমান (আ.) এর উপর অবতীর্ণ করেন। তখন ফিরিশতারা বলতে লাগলেন, আল্লাহর কসম! এখন সুলাইমান (আ.) এর রাজত্ব পূর্ণ হয়েছে। তারপর এ আয়াত উঠিয়ে নিলেন। তারপর আল্লাহ তাআলা এ আয়াত আমার উপর নাযিল করেন। আমার উম্মতরা পড়তে থাকবে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ আর এরই বরকতে কিয়ামতের দিন তাদের নেকীর পাল্লা ভারী হবে, তারা বেহেশতে প্রবেশ করবে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, হে আবূ হুরায়রা! তুমি উযূ করার সময় بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বলবে। এতে ফিরিশতারা তোমার উযূ শেষ না হওয়া পর্যন্ত নেকী লিখতে থাকবে। স্ত্রী সহবাসের সময় بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বলবে, এ জন্যেও ফিরিশতারা তোমার জন্য নেকী লিখতে থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত গোসল করনি। এ সহবাসে যদি কোনো সন্তান লাভ করো তা হলে তার জন্যে তার নিশ্বাস এর সংখ্যা অনুযায়ী নেকী লেখা হবে। আর সে সন্তান থেকে যে সন্তান হবে, তাদের নিশ্বাস অনুযায়ী নেকী লেখা হবে, এভাবে বংশ পরম্পরায় নেকী লেখা হবে। হে আবূ হুরায়রা! তুমি কোনো সওয়ারীর উপর আরোহণ করলে بسم الله والحمد لله বলবে। তাহলে সওয়ারীর প্রতি কদমে তোমার জন্যে নেকী লেখা হবে। নৌকায় সওয়ার হলে بسم الله والحمد لله বলবে। তা হলে নৌকা থেকে নেমে আসার পূর্ব পর্যন্ত তোমার জন্যে নেকী লেখা হবে।

হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, মহানবী (সা.) ইরশাদ করেন, যখন বনী আদম স্ত্রী সহবাস করার জন্য কাপড় খুলে ফেলে, তখন بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ তাঁদের লজ্জাস্থান ও শয়তানের চোখের মধ্যে পর্দা হয়।

এ থেকে এ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আল্লাহ তাআলার নাম যদি সহবাসের সময় শত্রুদের থেকে পর্দা হতে পারে, তাহলে কেন আখিরাতে তোমার আর দুযখ রক্ষীদের মধ্যে পর্দা হতে পারবে না?

গরীব, অন্ধ ও আতুর প্রকল্প : কিছু অনুভূতি

মাওলানা মো. ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী

অসীম প্রশংসা রাব্বুল আলামীনের। হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা রাহমাতুল্লিল আলামীনের মর্যাদা দান করে উম্মতকে বিশ্বের সকল দুঃখী মানুষের খিদমত গুজারের মন-মানসিকতা ও চেতনা দান করেছেন। অগণিত সালাত সালাম রাহমাতুল্লিল আলামীনের উদ্দেশ্যে।

যে সকল পবিত্র বাণী পাঠ করে আমি অসহায় অন্ধ ও আতুর মানুষের সাথে আমার ও আপনাদের সম্পর্ক স্থাপন করার প্রচেষ্টায় ব্রত হয়েছি; তার কিছু আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

হাদীসে কুদসী- হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি, তিনি বলেন- নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা বলেন, যখন আমি আমার কোন বান্দার দুটি চোখ বিপদগ্রস্ত করি (অর্থাৎ- অন্ধ হয়ে যায়) এবং সে সবর করে, তার দুটি চোখের বদলে আমি তাকে জান্নাত দান করি। (বুখারী শরীফ)

উল্লিখিত পবিত্র হাদীসে কুদসীর আলোকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, ধৈর্যশীল অন্ধ মুসলমান বান্দাকে আল্লাহ তাআলা জান্নাতের আশ্বাস দিয়েছেন। এখন আমরা তাদের সেবা যত্ন ও দুঃখ লাঘব করার চেষ্টায় অধিক উৎসাহিত হই এ জন্য যে, ঐ লোকটিকে আল্লাহ তাআলা জান্নাতের আশা দিয়েছেন।

আমরা যে সকল গরীব-মিসকীন অন্ধদের সাহায্য করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি, তারা সকলেই যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত মিসকীন। তাদের মধ্যে অনেক বিধবা, অন্ধ ও মিসকীন মহিলাও আছেন।

মিসকীন ও স্বামীহারা মহিলাদের সেবা যারা করেন, তাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন "স্বামীহারা মহিলা ও মিসকীনদের জন্য প্রচেষ্টাকারী (অর্থাৎ তাদের খিদমতকারী) আল্লাহর পথে জিহাদকারীর ন্যায়। সারাদিন যে রোযা রাখল, সারারাত্রি যে ইবাদত করল তার সমতুল্য।"

প্রকাশ থাকে যে, সঠিক জিহাদের মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে। কিন্তু যারা মিসকীন ও স্বামীহারা বিধবাদের সেবা করে তাদের আল্লাহর পথে জিহাদকারীর সাথে তুলনা করা হয়েছে। সর্বদা যারা রোযা রাখেন, সমস্ত রাত্রি ইবাদতে অতিবাহিত করেন তাদের সংখ্যা যেমন বিরল তাদের মর্যাদাও তেমন উন্নত। কিন্তু মিসকীন ও স্বামীহারা বিধবাদের সাহায্যকারীগণকে এমন মহৎ ব্যক্তিগণের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

৬০-৭০ বছর কাল অন্ধের জীবনে রাত আসে। রাতের শেষে প্রভাতী তারা উদিত হয়। সূর্যের সোনালি আভায় উজ্জ্বল হয় পথ ও প্রান্তর। কিন্তু অন্ধের জীবনের কালনিশী আরো দীর্ঘায়িত হয়। তমসাচ্ছন্ন দুঃখপূর্ণ জীবনের পথ যেন শেষ হতে চায় না। ৬০-৭০ বছরের অন্ধ, বৃদ্ধ-বৃদ্ধার জীবনের দুঃখের কাহিনী কাগজে কলমে লিপিবদ্ধ করা সহজ সাধ্য ব্যাপার নয়।

এ বিশাল পৃথিবীতে এমন একজন অন্ধ মানুষ রাহমাতুল্লিল আলামীনের উম্মতের নিকট তেমন কিছু চায় না। শুধু ক্ষুধা নিবারণের জন্য সামান্য খাদ্য, শীত-বৃষ্টি থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য ছোট্ট একখানা ঘর, বারো মাসে কমপক্ষে এক প্রস্থ কাপড় তারা চায়।

নয়নের আলো নিভিয়া গেল
চেনা জানা এ পৃথিবী আর দেখিব না।
এ ভবের মায়া যেন এক ছায়া
ছায়া দেখে এ জীবনে আর কাঁদিব না।
পাখি তুমি খাঁচা ছাড়ি শূন্য লোকে দিবে পাড়ি
দেহের পিঁজরে পাখি আর কাঁদিও না।

অন্ধ সাহায্য প্রকল্প শুরু হয় ২০০০ সালের আগস্ট মাসে। তার এক বছর পর শুরু হয় আতুর সাহায্য প্রকল্প। ২০০১ সালের ১৮ জুন মনের আবেগে শোকে দুঃখে জর্জরিত এক অবহেলিত গ্রামের কর্দমাক্ত পথ অতিক্রম করতে গিয়ে পতিত হয়ে ডান হাতখানা ভেঙ্গে ফেললাম। পথ থেকে উদ্ধার করে যারা আমাকে নিয়ে এসেছিলেন তাদের শুকরিয়া আদায় করার ভাষা এখনও খুঁজে পাই না। ঘর ছাড়লাম, অ্যাম্বুলেন্সে আরোহণ করে দেখলাম আমার পুত্র, কন্যাসহ বাড়ির সকল সজল নয়নে দাঁড়িয়ে আছেন। ভিড়ের মাঝখান থেকে শুনলাম শিশুকণ্ঠের ফরিয়াদ, আব্বা-আব্বা। তার পরে দেখলাম আমার শিশু পুত্রটিকে কে একজন কোলে তুলে নিয়ে শাড়ির আঁচলে তার অশ্রু ভেজা কচি মুখখানা মুছে দিলেন। অ্যাম্বুলেন্স সাইরেন বাঁজিয়ে বিদায় অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করল। প্রাণপ্রিয় পত্নী পিছনে পড়ে রইল। আমার জীবনতরীর কাণ্ডারিকে জিজ্ঞেস করলাম 'আমি কি গোরের কাফন পরে ঘরে প্রত্যাবর্তন করব? না জীবিত অবস্থায়?

মনে হলো কালের অ্যাম্বুলেন্স আমার মত কত ব্যথিত আহত মানুষকে আপনজন থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এক অজানা মঞ্জিলের পথে অগ্রসর হচ্ছে। কেউ আবার ঘরে ফিরে আসছে পঙ্গু হয়ে আবার কেউ কাফনে ঢাকা লাশ হয়ে।

আমার যখন দুর্ঘটনা হয় তখন আমার মহতরম ওয়ালিদ ছাহেব বাংলাদেশের বাইরে ছিলেন। ফোনে আলাপ করলেন। অনেকক্ষণ কাঁদলেন। জানতে পারলাম, তিনি হারামাইন শরীফ, সিরিয়া, জর্ডান ও ইউরোপ সফরকালে সবখানে আমার মতো এক অধম পুত্রের জন্য দুআ করেছেন। নির্জনবাসে অবস্থানকারী আমার 'মা' তার ছেলের জন্য রাব্বে কারীমের দরবারে নয়নজল আমানত রাখেন। মা ও বাবার দুআয় সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরলাম।

বাংলাদেশের কোনো গরীব পল্লীবাসী যখন আকস্মিক দুর্ঘটনার শিকার হয়ে পঙ্গু হয় তখন তার অসহায় পরিবার পরিজনের প্রতি যে মহৎপ্রাণ ব্যক্তিগণ সহানুভূতি প্রকাশ করেন তাদের সংখ্যা অতি অল্প। লোকটির বাড়ি অমুক পঙ্গু বা আতুরের বাড়ি নামে পরিচিতি লাভ করে। বিত্তশালী দানশীল শহরবাসী ব্যক্তিদের পক্ষে গ্রাম বাংলার দুর্গম পথ অতিক্রম করে পল্লীবাসী আতুরের গৃহ দর্শন সম্ভবপর হয়

না। গরীব পথচারী আতুরের বাড়ির পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করার সময় আল্লাহ তাআলার কাছে তার মঙ্গল কামনা করেন। প্রতিবেশীদের অনেকে অনেক সময় সামান্য সাহায্যও করেন।

চেনা জানা লোকালয়
বহু দূর মনে হয়
বিকল চরণে আমি চলিতে পারি না।
পিতার ভিটার মায়া
গ্রামের শ্যামল ছায়া
বাঁধিয়া রাখিল মোরে মায়ার ডোরে।
আমার মরণ পরে
দয়াময় দয়া করে
রাখিও অনাথদেরে তোমার নজরে।

রোজগারের উপকরণঃ অন্ধ, আতুর ও মিসকিন ফকিরদের সেবাকর্মের একটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাদের মধ্যে সক্ষম ব্যক্তিকে রোজগারের উপকরণ দান করা অথবা ব্যবসার ব্যবস্থা করা। আলহামদুলিল্লাহ! আমরা এই উদ্দেশ্যে ক্রমশ প্রচেষ্টা শুরু করি। যাদের স্ত্রী পুত্র কন্যা বাঁশ বেতের কাজ করতে পারেন তাদের বাঁশ খরিদ করে দেওয়া, যারা পাটি প্রস্তুত করতে পারেন তাদেরকে মূর্তা খরিদ করে দেওয়া, যারা হাঁস-মোরগ পালন করতে পারেন তাদেরকে হাঁস-মোরগ খরিদ করে দেওয়া ইত্যাদি। আমাদের নগণ্য চেষ্টা প্রচেষ্টা মুসলিম হ্যান্ডস সংস্থার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ সংস্থা অন্ধ, আতুর ও বিধবা এতীম পরিবারকে ৯২টি দোকান তৈরী করে দিয়ে পুঁজি দান করেছে। ফলে তারা ভিক্ষাবৃত্তি সম্পূর্ণ ত্যাগ করে ব্যবসা করছেন। আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি এমন অনেক মিসকিন পরিবার আছে যারা রোজগার করতে চায়; কিন্তু উপকরণ না থাকায় রোজগার করতে পারে না। অন্ধ, আতুর ছাড়াও এমন অনেক মিসকিন দিনমজুর আছেন যারা ভিক্ষা না করে হালাল রোজগার করতে চান; কিন্তু রোজগারের উপকরণ না থাকায় অপেক্ষাকৃত কম পারিশ্রমিকে কাজ করেন। যেমন-

ঠেলাঃ একজন ঠেলাওয়ালা ৩-৪ জনের পরিবারের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা ঠেলা দ্বারা করতে পারেন।

সেলাই মেশিনঃ সেলাই শিক্ষা করেছেন এমন এতীম মেয়েকে একটি সেলাই মেশিন দান করলে কমপক্ষে পরিবারের দুই জনের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা হয়।

ছোট নৌকাঃ ছোট নৌকা হাওর অঞ্চলে নদীর তীরে বসবাসকারী মিসকিন নৌকায় বর্ষা মৌসুমে মাছ শিকার, খেয়া পারাপার, মাল পরিবহন করে ৫/৬ জনের পরিবার পরিচালনা করতে পারেন।

বাংলাদেশের সীমান্তঃ পাহাড়ি এলাকার লোকেরা পাথর ও কাঠ কেটে জীবিকা নির্বাহ করেন। কুড়াল, সাবল ও করাত তাদের জন্য উত্তম রোজগারের উপকরণ। মাটি কাটার একটি কুদাল দিয়ে মাটি কেটে পরিবার পরিচালনা করেন তাদের জন্য কুদাল একটি উত্তম উপকরণ।

জালঃ বর্ষা মৌসুমে জাল রোজগারের উত্তম একটি উপকরণ। আমরা এমন কয়েকটি পরিবারকে জাল, নৌকা, ঠেলা, গাছ কাটার করাত, সেলাই মেশিন, দা, কুড়াল, কুদাল, সাবল ইত্যাদি দান করে দেখলাম অন্যের কাছে হাত পাততে হয় না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিসকীন ফকীরদের মধ্যে যারা অক্ষম অর্থাৎ কোনো কর্ম করতে পারেনা তাদের খাদ্য দান করা ও খিদমত করার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। অন্যদিকে যারা সক্ষম অর্থাৎ কোনো কাজ করতে সক্ষম, তাদেরকে অন্যের মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজে পরিশ্রম করে উপার্জন করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাদের রোজগারের উপকরণের ব্যবস্থা করেছেন।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র হাদীসের তরজমা নিম্নে উদ্ধৃত করলাম- হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, এক আনসার ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে সাওয়াল করলেন, তিনি বললেন, "তোমার ঘরে কোনো জিনিস আছে কি? (আনসার) নিবেদন করলেন, হ্যাঁ আছে, এক খণ্ড কাপড় যে কাপড়ের একাংশ উপরে এবং এক অংশ নিচে বিছাই। আর একটি পিয়ালা আমি পানি পান করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দুটি জিনিস নিয়ে এসো। (নির্দেশমত) ঐ ব্যক্তি দুটি জিনিস নিয়ে আসলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিনিস দুটি হাতে তুলে নিয়ে বললেন- কে খরিদ করবে এ দুটি জিনিস? এক ব্যক্তি বললেন আমি এক দিরহামের বিনিময়ে জিনিস দুটি গ্রহণ করব। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইবার বা তিনবার বললেন কেউ কি এক দিরহামের অধিক দিতে পারবে।" তখন অন্য ব্যক্তি বললেন, আমি দুই দিরহাম দিতে পারব। তখন ঐ ব্যক্তিকে জিনিস দুটি দিয়ে দুটি দিরহাম গ্রহণ করলেন এবং আনসার কে দিয়ে বললেন, তুমি এক দিরহামের খাদ্য দ্রব্য খরিদ করে তোমার পরিবার পরিজনকে দাও আর এক দিরহাম দ্বারা তুমি কুড়াল খরিদ করে আমার নিকট নিয়ে এসো।

নির্দেশমত আনসারী কাজ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুড়ালখানায় নিজ হাতে কাঠের বাট বা হাতল লাগিয়ে দিয়ে বললেন, কাঠ সংগ্রহ করে বিক্রয় করো। পনের দিন যেন তোমাকে না দেখি। (অর্থাৎ ১৫ দিন একাধারে কাঠের ব্যবসা করো) ঐ ব্যক্তি নির্দেশমত কাঠ এনে বিক্রয় শুরু করলেন। তারপর দশ দিরহাম উপার্জন করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ দ্বারা কিছু খাদ্য ও কিছু বস্ত্র খরিদ করো। ইহা তোমার জন্য সাওয়ালের উদ্দেশ্যে আসার চেয়ে উত্তম।

বড় অবহেলা ভরে যৌবনের দিনগুলি শেষ করেছি। এখন আমি বৃদ্ধ; কিন্তু অন্ধ, আতুর, এতীমদের দুঃখের আলয় দর্শনের অভিলাষে আমাকে যুবকের শক্তি দান করে। আমার আত্মার আত্মীয় অন্ধ, আতুর, এতীম ও বিধবার একটি বিরাট শোক মিছিলে আত্মগোপন করতে চাই। এ কাফেলায় সবচেয়ে অসহায় মানুষরূপে আমার আমিত্বকে বিসর্জন দিতে চাই।

হয়তো আমার এ পৃথিবী থেকে বিদায়ের শেষ মিছিলে দুএকজন অন্ধ, আতুর ও এতীম অংশগ্রহণ করবে। কম্পিত হাতে হয়তো বা কোন অন্ধ ও আতুর আমার কবরের বুকে তার নয়নজলে সিক্ত একমুঠো মাটি রাখবে। হয়তো কোন এতীম তার কচি হাতে আমার এতীম ছেলেদের সাথে আমার কবরের বুকে তার নিষ্পাপ চোখের জলে সিক্ত এক মুঠি মাটি রাখবে।

জানিনা কখন হবে জনমের ইতি
তাই মাটিতে ছড়ায়ে দেই একমুঠো প্রীতি।

দারসুল হাদীস

নিয়তের গুরুত্ব

মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান

হাদীসের মূলভাষ্য

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الدُّنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ". (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ: হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "নিশ্চয় সকল কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর প্রত্যেক ব্যক্তি তাই পাবে যা সে নিয়ত করে। সুতরাং যার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য হবে, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্যই। আর যার হিজরত দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে অথবা কোনো মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হবে তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই বিবেচিত হবে যে জন্য সে হিজরত করেছে।" (বুখারী ও মুসলিম)

বর্ণনার প্রেক্ষাপট: পবিত্র কুরআন মজীদের কোনো আয়াত বা সূরা নাযিলের পেছনে কোনো বিশেষ ঘটনা বা কারণ থাকলে তা এর 'সববে নুযূল' নামে পরিচিত। আর হাদীস বর্ণনার পেছনে কোনো বিশেষ ঘটনা থাকলে তা 'সববে উরুদ' নামে পরিচিত। এ হাদীসের পেছনে একটি বিশেষ ঘটনা রয়েছে। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র.) লিখেছেন, ইমাম তাবারানী 'আল মু'জামুল কাবীর' গ্রন্থে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের সনদে উল্লেখ করেছেন, হযরত আবূ ওয়াইল থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন; তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি 'উম্মু কায়স' নাম্নী এক মহিলার নিকট বিবাহের প্রস্তাব পাঠালেন। উম্মু কায়স উক্ত ব্যক্তির হিজরত করা ছাড়া তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে অস্বীকার করলেন। তখন সে ব্যক্তি হিজরত করে তাকে বিবাহ করলেন। (ইবনু মাসউদ বলেন) আমরা তাকে 'মুহাজিরু উম্মি কায়স' তথা উম্মু কায়স নাম্নী মহিলার উদ্দেশ্যে হিজরতকারী বলে ডাকতাম। (উমদাতুল কারী, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৮)

আল্লামা আইনী (র.) বলেন, ইবনু দাহিয়া বলেছেন, এ মহিলার নাম 'কায়লাহ'। তবে উক্ত ব্যক্তির নাম জানা যায়নি। (প্রাগুক্ত)

বিভিন্ন কিতাবে হাদীসটি প্রথমে উল্লেখ করার কারণ: অনেক উলামায়ে কিরাম দারস বা গ্রন্থ রচনার শুরুতে এ হাদীস প্রথমে উল্লেখ করা মুস্তাহাব মনে করেন। এর দ্বারা তাঁদের উদ্দেশ্য হলো, দারসে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী ও গ্রন্থ পাঠকারীদের পরিশুদ্ধ নিয়তের প্রতি সতর্ক করা ও এর প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা। ইমাম বুখারী (র.) তাঁর 'আল জামিঈ আস-সহীহ' এর শুরুতে এ হাদীস এনেছেন। অনুরূপ অনেক মুহাদ্দিস করেছেন। ইমাম আবূ সুলায়মান আল খাত্তাবী (র.) বলেছেন, আমাদের পূর্বসূরী শায়খগণ সকল কাজের আগে নিয়তের হাদীসকে উল্লেখ করতেন। ইমাম আবূ সাঈদ আবদুর রাহমান ইবনু মাহদী (র.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো কিতাব রচনা করতে চায় সে যেন এ হাদীস দ্বারা তা শুরু করে।

রাবী পরিচিতি: এ হাদীসের মূল রাবী তথা বর্ণনাকারী হলেন হযরত ওমর (রা.)। তাঁর পিতার নাম খাত্তাব। উপনাম আবূ হাফস। ফারুক তাঁর উপাধি। তিনি ছিলেন আমীরুল মুমিনীন, মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলীফা। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জন্মের তেরো বছর পর ৫৮৩ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর জন্ম। নবুওয়াতের ষষ্ঠ বর্ষে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তেরো হিজরীতে হযরত আবূ বকর (রা.)-এর ইন্তিকালের পর তিনি খলীফা হন এবং দীর্ঘ দশ বছর ছয় মাস পাঁচ দিন খেলাফতের মসনদে আসীন ছিলেন। ২৩ হিজরী সনের ২৭ যিলহজ্জ তারিখে ফজরের নামাযের সময় তিনি অগ্নি উপাসক আততায়ী আবূ লুলুর হাতে আহত হন এবং ১ মুহররম শাহাদাত বরণ করেন।

হাদীস প্রাসঙ্গিক কিছু কথা: এ হাদীস ইসলামের মূলনীতি সম্পর্কিত হাদীসসমূহের একটি। এটি মুত্তাফাকুন আলাইহি হাদীস। কেউ কেউ একে মুতাওয়াতির পর্যন্ত বলেছেন। তবে আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র.) বলেছেন, হাদীসটি মুতাওয়াতির নয়; মাশহুর।

উলামায়ে কিরামের মতে, দ্বীন যে সকল হাদীসের উপর নির্ভরশীল এ হাদীস তন্মধ্যে একটি। ইমাম শাফিঈ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, এ হাদীস দ্বীনের তিন ভাগের এক ভাগ। ইমাম আবূ দাউদ (র.) বলেন, এটি দ্বীনের অর্ধেক। ইমাম আহমদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইসলামের মূলনীতি তিনটি হাদীসের উপর নির্ভরশীল। এগুলো হলো-

১. হযরত উমর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস- إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ -নিশ্চয় সকল কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল।

২. হযরত আয়শা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস- مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هذا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ -যে আমাদের দ্বীনের মধ্যে এমন নতুন বিষয় আবিষ্কার করে, যা এর অন্তর্ভুক্ত নয়, তা পরিত্যাজ্য।

৩. হযরত নু'মান ইবনু বশীর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস- إِنَّ الحَلالَ بَيِّنٌ وإِنَّ الحَرَامَ بَيِّنٌ -নিশ্চয় হালাল সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট।

হাদীসের ব্যাখ্যা: এ হাদীসে নিয়তের বিশুদ্ধতা তথা ইখলাসের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। হাদীসের সারকথা হলো, নিয়ত যেমন হবে ফল বা সাওয়াবও তেমন হবে। যদি ব্যক্তি খুলুসিয়াতের সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোনো কাজ সম্পাদন করেন তাহলে তিনি সে অনুযায়ী সাওয়াব প্রাপ্ত হবেন। পক্ষান্তরে দুনিয়াবি কোনো ফায়দা হাসিলের উদ্দেশ্যে যদি কাজ সম্পাদন করেন তাহলে তিনি সে অনুযায়ী ফল পাবেন।

রাসূলে পাক (সা.) বিশেষ কারণে (যা হাদীস বর্ণনার প্রেক্ষাপটে উল্লেখ আছে) এ হাদীসে হিজরতের প্রসঙ্গ এনেছেন এবং একথা

সুস্পষ্ট করেছেন যে, কেউ যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে হিজরত করেন তাহলে তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে পরিগণিত হবে। পক্ষান্তরে কেউ দুনিয়া লাভ কিংবা কোনো মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হিজরত করেন তাহলে তার হিজরত তার সে দুনিয়াবি উদ্দেশ্যেই পরিগণিত হবে। অর্থাৎ খালিসভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে হিজরতকারীগণ যে সাওয়াব প্রাপ্ত হবেন দ্বিতীয় ব্যক্তি সে সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হবেন।

এ হাদীস থেকে মূলনীতি হলো- নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, দান, সদকা ইত্যাদি সকল আমলের সাওয়াব নিয়তের ভিত্তিতেই নির্ধারিত হয়। এটি হানাফী উলামায়ে কিরামের অভিমত। সুতরাং কেউ যদি দুনিয়াবি উদ্দেশ্যে কোনো নেক আমল করেন তাহলে সে আমল তার জন্য পরকালীন কোনো সুফল বয়ে আনবে না। আর শাফিঈগণের মতে, নিয়ত ছাড়া কোনো আমল শুদ্ধই হবে না। এ বিষয়টি নিয়ে উলামায়ে কিরাম দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। পরিসর স্বল্পতার কারণে আমরা এখানে তা আলোচনা করছি না।

হাদীসের মূল শিক্ষা: হাদীসের মূল শিক্ষা হলো, সকল কাজে নিয়তকে বিশুদ্ধ করা আবশ্যক। যদি নিয়ত বিশুদ্ধ না হয় আমল নেক হলেও তাতে কোনো ফায়দা হবে না। কেউ যদি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নামায পড়েন তাহলে তার সে নামায কোনো সুফল বয়ে আনবে না। কেউ যদি নিজেকে দানশীল হিসেবে পরিচিত করার জন্য দান সদকা করেন তাহলে তার সে দান-সদকাও কোনো কাজে আসবে না। পক্ষান্তরে কেউ যদি তাঁর স্বাভাবিক কাজ-কর্মকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে নির্ধারিত করে নেন তাহলে তার এ স্বাভাবিক কাজ-কর্মও ইবাদত হবে, সাওয়াব লাভের কারণ হবে। যেমন আমরা প্রতিদিন দু-তিন বেলা খাবার গ্রহণ করি। সাধারণত এতে খাদ্যের চাহিদা পূরণ ছাড়া অন্য কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে না। কিন্তু যদি আমরা খাবারের উদ্দেশ্য 'আল্লাহর ইবাদাতের জন্য শরীর সুস্থ-সবল রাখা' বানিয়ে নেই তাহলে এ থেকে যেমন আমাদের খাদ্যের চাহিদা পূরণ হবে তেমনি সাওয়াবও হবে। আমরা কুরবানী করি, কুরবানীর গোশত আমরা নিজেরা খাই, কিন্তু এর দ্বারা আল্লাহর কুরবত বা সাওয়াবের প্রত্যাশা করি সেতো নিয়তের ভিত্তিতেই। সুতরাং জীবনের প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম পালন ও সন্তুষ্টিকে উদ্দেশ্য বানিয়ে নিলে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ইবাদত হিসেবে পরিগণিত হবে। আল্লাহ মানুষকে কেবল তাঁর ইবাদতের জন্য বানিয়েছেন। কিন্তু সবসময় কি আল্লাহর ইবাদত করা সম্ভব? হ্যাঁ, এভাবে নিয়তকে পরিশুদ্ধ করার মাধ্যমে তা সম্ভব হবে।

আল্লাহ আমাদের প্রতিটি মুহূর্তকে তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে খালিস করার তাওফীক দান করুন, যাতে আমরা আকুণ্ঠ চিত্তে উচ্চারণ করতে পারি

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (سورة الانعام: ٢٦١)

-নিশ্চয় আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য। (সূরা আনআম: ১৬২)

বাংলাদেশ আনজুমানে তালামীযে ইসলামিয়া'র
পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্মারক
সুবহে সাদিক
১৪৪২ হিজরী ২০২০ ঈসায়ী

ও
ক্যালেন্ডার-২০২১

প্রকাশ হয়েছে
আপনার কপি সংগ্রহ করুন
বাংলাদেশ আনজুমানে তালামীযে ইসলামিয়া

আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা.)

মাওলানা মো. নজমুদ্দীন চৌধুরী

নাম ও বংশ পরিচয়

তাঁর নাম- আলী বিন আবি তালিব বিন আবদিল মুত্তালিব বিন হাশিম বিন আবদে মনাফ বিন কুসাই বিন কিলাব বিন মুররা বিন কা'ব বিন লুয়াই বিন গালিব বিন ফিহর। ফিহরকে কুরাইশ বলা হয়। ফিহর এবং তাঁর আওলাদকে কুরাইশী বলা হয়।

কুরাইশ গোত্রের মধ্যে হাশিমীগণ বংশ মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ। হাশিমের আওলাদকে হাশিমী বলা হয়। হযরত আলী (রা.) হাশিমী ছিলেন। হযরত আলী (রা.)-এর মাতার নাম ফাতিমা বিনতে আসাদ বিন হাশিম। হযরত আলী (রা.) হাশিমী পিতা-মাতার সন্তান। এখানে হাশিমী বংশের মর্যাদাজ্ঞাপক একটি হাদীস বর্ণনা করা হলো:

عن واسلة بن الأسقع قال سمعت رسول الله صلى عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانه من ولد اسمعيل- واصطفي قريشا من كنانه واصطفي من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم (رواه مسلم)

-"ওয়াসীলা বিন আসকা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূলকে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহপাক ইসমাঈল (আ.)-এর আওলাদের মাঝে কেনানাকে মনোনীত করেছেন এবং কেনানার আওলাদের মাঝে কুরাইশকে মনোনীত করেছেন এবং কুরাইশের মাঝে বনূ হাশিমকে এবং বনূ হাশিমের মাঝে আমাকে মনোনীত করেছেন।" (মুসলিম)

উল্লিখিত হাদীস দ্বারা সমগ্র কুরাইশ বংশের মাঝে হাশিমীদের বংশ মর্যাদা সবচেয়ে বেশি এ কথা প্রমাণিত হয়।

বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিব এর সম্পর্ক

ইসলামপূর্ব যুগে ও ইসলামের পরে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে আবদে মনাফের বংশের বিশেষ সম্পৃকতা আছে বিধায় এ বংশ সম্বন্ধে একটি স্বচ্ছ ধারণা থাকা আবশ্যক। কুরাইশ বংশের অধস্তন পুরুষ আবদে মনাফের পাঁচজন পুত্র ছিলেন। যথা: ১. হাশিম ২. আবদে শামস ৩. মুত্তালিব ৪. নওফল ৫. আবূ উমর। হাশিম, আবদে শামস ও মুত্তালিব এ তিনজনের মাতা আতিকা বিনতে মুররা। ৪র্থ পুত্র নওফলের মাতার নাম ওয়াকিদা বিনতে আমর। ৫ম পুত্র আবূ উমর এর মাতা সাকিফ গোত্রের মহিলা ছিলেন।

হাশিম ও আবদে শামস যমজ ভাই। জন্মের সময় একজনের আঙুল অন্যজনের কপালের সাথে যুক্ত ছিল। ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে আঙুল ও কপাল আলাদা করা হয়। এতে রক্তপাত ঘটে। এ থেকে লক্ষণ ধরে নেওয়া হয় যে, এদের মাঝে রক্তপাত ঘটবে।

আবদে মনাফের মৃত্যুর পর হাশিম কা'বার মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত হন। হাজীদের জন্য পানি সরবরাহসহ অন্যান্য সেবাদানের বিষয় তাঁর দায়িত্বে আসে। হাশিম সমাজসেবা, বদান্যতা ও অন্যান্য নেতৃত্বসুলভ প্রশংসনীয় গুণাবলি হেতু সমাজে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। আবদে শামসের পুত্র উমাইয়া হাশিমের প্রতি বড়ই ঈর্ষান্বিত ছিলেন। হাশিমের প্রতি ঈর্ষাকাতর উমাইয়া নিজেকে কুরাইশ নেতা হিসাবে দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হাশিমের ব্যক্তিত্বের তুলনায় উমাইয়ার গ্রহণযোগ্যতা কুরাইশের কাছে অতি নগণ্য ছিল। ফলে তার এ উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হয়নি। (উমাইয়া ও হাশিমের দ্বন্দ্বের কথা তারিখে তাবারীতে বিশদভাবে বর্ণিত আছে)

ইসলামপূর্ব যুগে ও ইসলামের সময়ে উমাইয়া ও তাঁর বংশধর এবং নওফল ও তাঁর বংশধর পরস্পর একজোট ছিলেন। অন্যদিকে হাশিম ও তাঁর বংশধর এবং মুত্তালিব ও তাঁর বংশধর পরস্পর একজোট ছিলেন। রাসূল (সা.) এর পূর্বপুরুষ হাশিমের সাথে তাঁর (হাশিমের) ভাই মুত্তালিবের একাত্মতার কারণে মুত্তালিবীগণ রাসূল (সা.)-এর যাউয়িল কুরবা বা নিকটাত্মীয় হিসেবে স্বীকৃত।

রাসূল (সা.) 'ফায়' এর মাল বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিবকে যাউয়িল কুরবা বা নিকটাত্মীয় হিসেবে দান করলেন। বনূ উমাইয়া ও বনূ নওফল 'ফায়' এর মাল থেকে বঞ্চিত রইলেন। এ প্রসঙ্গে তাফসীরে মাযহারীতে বর্ণিত আছে, যুবায়র বিন মুতঈম (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা.) তাঁর নিকটাত্মীয় বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিবকে যখন মাল দিলেন (অর্থাৎ ফায় এর মাল) তখন আমি এবং উসমান (রা.) রাসূল (সা.)-এর খিদমতে হাজির হয়ে আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহপাক আপনাকে বনূ হাশিমে জন্ম দিয়েছেন। তাই আমরা আমাদের ভাই বনূ হাশিমের মর্যাদার কথা অস্বীকার করি না। কিন্তু আমাদের ভাই বনূ মুত্তালিব এর সাথে আপনার বংশগত নৈকট্য এবং আমাদের সাথে আপনার বংশগত নৈকট্য সমান। এরপরও আপনি মাল বণ্টনকালে তাদেরকে দিলেন, কিন্তু আমরা বঞ্চিত রইলাম। তখন রাসূল (সা.) এক হাতের আঙুল অন্য হাতের আঙুলে রেখে জালের মতো করে বললেন, বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিব এভাবে একই।

আবূ দাউদ ও নাসাঈ শরীফে বর্ণিত আছে রাসূল (সা.) বললেন, আমি এবং বনূ মুত্তালিব জাহিলিয়াতের যুগেও আলাদা ছিলাম না, ইসলামের যুগেও নয়। আমরা এবং তারা একই। এ সময় রাসূল উভয় হাতের আঙুল একত্র করে জালের মতো করেছিলেন।

আল্লাহপাক ইরশাদ করেন,

مَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ

-"আল্লাহ জনপদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রাসূলকে যা দিয়েছেন তা আল্লাহর, রাসূলের, তাঁর আত্মীয় স্বজনদের, ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্তদের এবং মুসাফিরদের জন্য।"

উল্লিখিত আয়াতে ফায় এর মাল বণ্টনের খাতসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে (তবে কোনো

পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়নি, পরিমাণ রাসূল (সা.) ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল)। এখানে ফায় এর মালের খাতগুলোর মধ্যে একটি খাত রাসূল (সা.) এর আত্মীয়-স্বজন হিসেবে রাসূল (সা.) বনূ হাশিমের সাথে কেবল হাশিমের ভ্রাতা মুত্তালিবের আওলাদকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। হাশিমের অন্য ভ্রাতা আবদে শামসের আওলাদ বনূ উমাইয়া ও বনূ নওফলকে স্বজন হিসাবে স্বীকৃতি দেননি।

উল্লেখ্য, যুদ্ধকালীন সময়ে বিনা যুদ্ধে শত্রুর কাছ থেকে যে মাল পাওয়া যায় তাকে 'ফায়' বলা হয়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রতি হযরত আলী (রা.) এর পিতা-মাতার স্নেহ-ভালোবাসা

রাসূল (সা.)-এর দাদা আব্দুল মুত্তালিবের ইন্তিকালের পর হযরত আলী (রা.)-এর পিতা আবূ তালিব রাসূল (সা.)-এর লালন-পালনের ভার গ্রহণ করেন। মৃত্যু পর্যন্ত আবূ তালিব রাসূল (সা.)কে অব্যাহত সহযোগিতা করে গেছেন।

আর হযরত আলী (রা.)-এর মাতা ফাতিমা বিনতে আসাদ পুত্রস্নেহে রাসূল (সা.) কে লালন-পালন করেছেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং হিজরত করেছেন। রাসূল (সা.)ও তাঁকে আপন মায়ের মতো দেখেছেন এবং তাঁর প্রতি সর্বোচ্চ সদাচার করেছেন, যা তাঁর (ফাতিমা বিনতে আসাদের) ইন্তিকাল পরবর্তী ঘটনা থেকে বুঝা যায়। ফাতিমা বিনতে আসাদ এর ইন্তিকাল বিষয়ে দুটি হাদীস এখানে উল্লেখ করা হলো-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا مَاتَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَسَدِ بْنِ هَاشِمٍ أُمُّ عَلِيٍّ رضي الله عنهما دَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ عِنْدَ رَأْسِهَا فَقَالَ رَحِمَكِ اللَّهُ يَا أُمِّي كُنْتِ أُمِّي بَعْدَ أُمِّي تَجُوعِينَ وَتُشْبِعِينِي وَتَعْرَيْنَ وَتَكْسُونَنِي وَتَمْنَعِينَ نَفْسَكِ طَيِّبَ الطَّعَامِ وَتُطْعِمِينِي تُرِيدِينَ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ وَالدَّارَ الآخِرَةَ. ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَأَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ وَعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَغُلاَمًا أَسْوَدَ يَحْفِرُوا فَحَفَرُوا قَبْرَهَا فَلَمَّا بَلَغُوا اللَّحْدَ حَفَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ وَأَخْرَجَ تُرَابَهُ بِيَدِهِ. فَلَمَّا فَرَغَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاضْطَجَعَ فِيهِ وَقَالَ اللَّهُ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ اغْفِرْ لأُمِّي فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدٍ وَلَقِّنْهَا حُجَّتَهَا وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مُدْخَلَهَا بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَالأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِي فَإِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ثُمَّ كَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا ثُمَّ أَدْخَلُوهَا الْقَبْرَ هُوَ وَالْعَبَّاسُ وَأَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رضى الله عنهم. (رواه الطراني فى الكبير والاوسط)

-আনাস বিন মালিক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আলী (রা.) এর মাতা ফাতিমা বিনতে আসাদ যখন ইন্তিকাল করলেন তখন রাসূল (সা.) তাঁর শিয়রের পাশে বসলেন অতঃপর বললেন, আল্লাহ! তোমার উপর রহম করুন। আমার মায়ের পরে তুমিই ছিলে আমার মা। তুমি না খেয়ে, না পরে আমাকে খাইয়েছ, পরিয়েছ (তুমি না খেয়ে না পরে আমার খাওয়া পরায় যন্ত্রণা নিয়েছ), নিজেকে ভালো খাবার থেকে বঞ্চিত রেখেছ আর আমাকে পরিতৃপ্ত করেছ। এর দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতের সাওয়াব কামনা করেছ। অতঃপর উসামা বিন যায়দ, আবূ আইয়ূব আনসারী, উমর বিন খাত্তাব এবং একজন দাসকে কবর খনন করার আদেশ দিলেন। তারা কবর খনন করে যখন লাহাদ খোদাইয়ের পর্যায়ে পৌঁছলেন তখন রাসূল (সা.) নিজ হস্তে লাহাদ খোদাই করে মাটি বের করলেন। কবর শেষ করে নিজে কবরে শুইলেন এবং বললেন, তিনি আল্লাহ, যিনি জীবিত করেন এবং মৃত্যুদান করেন, তিনি চিরঞ্জীব, তার মৃত্যু নেই, আমার মা ফাতিমা বিনতে আসাদকে ক্ষমা করুন, পূর্বেকার নবীগণের খাতিরে মাফ করে দিন, তাকে ঈমানের বাক্য শিখিয়ে দিন এবং তার কবরকে প্রশস্ত করে দিন। কেননা তুমি আরহামুর রাহিমীন। তারপর চার তাকবীরে জানাযা পড়লেন ও তিনি নিজে আব্বাস (রা.) ও আবূ বকর সিদ্দিক (রা.) কে নিয়ে ফাতিমা বিনতে আসাদের মৃতদেহ কবরে রাখলেন। (তাবারানী, মাজমাউয যাওয়াইদ, পৃষ্ঠা ২৫৯-২৬০)

অন্য বর্ণনায় আছে,

عن ابن عباس قال لما ماتت فاطمة أم علي ألبسها النبي قميصه واضطجع معها في قبرها فقالوا ما رأيناك يا رسول الله صنعت هذا فقال إنه لم يكن أحد بعد أبي طالب أبر بي منها إنما ألبستها قميصي لتكسى من حلل الجنة واضطجعت معها ليهون عليها(رواه الطراني)

-হযরত আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফাতিমা বিনতে আসাদ যখন ইন্তিকাল করলেন তখন রাসূল (সা.) তার জামা খুলে ফাতিমাকে পরিয়ে দেওয়ার জন্য দিলেন এবং তার কবরে শুইলেন। যখন কবরের মাটি বরাবর করা হলো, তখন সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা আপনাকে এমন কাজ করতে দেখলাম যা আপনি অন্য কারো জন্য করেননি। রাসূল (সা.) উত্তর দিলেন, আমি আমার জামা এজন্য পরিয়ে দিয়েছি যাতে তিনি জান্নাতের পোশাক পরিধান করেন। আর কবরে শয়ন করলাম যাতে তার কবরের চাপ সংকীর্ণ তথা হালকা হয়। আবূ তালিবের পর তিনিই সৃষ্টির মাঝে আমার সাথে সর্বোত্তম ব্যবহারকারিনী। (তাবারানী, মাজমাউয যাওয়াইদ, পৃষ্ঠা ২৬০)

[চলবে]

প্রোঃ আফতাব আহমদ
মোবাইল: ০১৭১৫৭৪৭২৪৮

দি নুরজাহান মেডিকেল হল

পাইকারি ও খুচরা ঔষধ বিক্রেতা

ডাক বাংলা রোড, জকিগনজ পৌরসভা, জকিগনজ, সিলেট

ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)

যার কীর্তি, যার স্মৃতি চির ভাস্বর

রূহুল আমীন খান

'ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)' এতটুকু পরিচিতিই যথেষ্ট। এই মুবারক অভিধাটি শ্রবণ মাত্র, উচ্চারণ মাত্র মানস-নেত্রে, মনের মুকুরে ভেসে ওঠে যে জ্যোতির্ময় অবয়ব–সুন্নতী লেবাসে ভূষিত, সবুজ পাগড়ি পরিহিত, প্রভাব বিস্তারী গৌরকান্তি, বলিষ্ঠ, সুঠাম অবয়ব বিশিষ্ট, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি সম্পন্ন অনন্য ব্যক্তিত্ব, বীরত্বব্যঞ্জক কালজয়ী নূরানী মহাপুরুষ-সত্তা–তাঁর জীবন ও কর্ম তো এক মহাপারাবার। বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে তার সামান্যমাত্র অবলোকন করা যায় তাতে পাড়ি জমানো যায় না, তাঁকে পুরোপুরি উপলব্ধিও করা যায় না।

তাঁর সুযোগ্য নাতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক মাওলানা আহমাদ হাসান চৌধুরী সম্পাদিত ২০১৪ সালে প্রকাশিত এক স্মারকগ্রন্থে দেশ-বিদেশের বহু খ্যাতনামা উলামা-মাশায়িখ, গবেষক, লেখক, চিন্তাবিদ, কবি-সাহিত্যিক তাঁর জীবন ও অবদানের এক একটি দিক তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁদের কেউ তাঁকে বলেছেন, 'A Great Scholar'; কেউবা 'A Spiritual Master'; 'The Sun of Asia'; 'এক পবিত্র আলোকবর্তিকা'; 'শরীআত, তরীকত ও মা'রিফাতের আফতাব'; 'আদর্শ মর্দে মুমিন'; 'আখলাকে নববীর অনুপম দৃষ্টান্ত'; 'অনন্য আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব'; 'এশিয়ার শ্রেষ্ঠতম বুযুর্গ'; 'বিংশ শতাব্দীর বিস্ময়কর প্রতিভা'; 'ভারতবর্ষেও যার খিদমতের ধারা বহমান'; 'সুন্নতে নববীর পূর্ণ অনুসারী', 'ইলমে কিরাতের বিস্তারে যার ভূমিকা ঐতিহাসিক'; 'দ্বীনী আন্দোলনের অকুতোভয় সিপাহসালার'; 'মাদরাসার স্বাতন্ত্র্য রক্ষার আন্দোলনের নির্ভীক সিপাহসালার'; 'যামানার শ্রেষ্ঠ বুযুর্গ'; 'ইসলামী শিক্ষা আন্দোলনের সিপাহসালার'; 'মানবহিতৈষী বুযুর্গ'; 'শতাব্দীর সেরা ব্যক্তিত্ব'; 'সৃষ্টির প্রতি যার ছিল ভালোবাসা সীমাহীন'; 'লক্ষ লক্ষ মানুষের রূহানী পিতা'; 'মরণজয়ী পীরে কামিল'; 'বাংলার রূমী'; 'শামসুল উলামা'; ইত্যাদি।

আগেই বলেছি সে এক অনন্ত পারাবার। এতে পাড়ি জমানো এক অসাধ্য ব্যাপার। তবু বিভিন্ন সময়ে সীমাহীন অক্ষমতা সত্ত্বেও তাঁর রূহানী ফয়েযে ধন্য হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় চেষ্টা করেছি তাঁকে উপলব্ধি করার। একদা লিখেছিলাম :

'রাসূল দেখিনি বটে, তাঁরই এক মূর্তমান ছবি
নবী তুমি ছিলে নাকো, ছিলে তাঁর প্রতিনিধি
হে নায়েবে নবী।'

লিখেছিলাম :

তালীম ও তিলাওয়াতে কুরআনে যিনি রঈসুল কুররা
ইলমে জাহেরে যিনি শামসুল উলামা
ইলমে বাতেনে যিনি ছাহেবে কাশফ ও কারামত মুর্শিদে কামিল ও মুকাম্মিল
ভাষণ ও বাগ্মীতায় যিনি খতীবে আযম
শিরক, বিদাত, বাতিল, গোমরাহী দূরীকরণে যিনি মহান সংস্কারক–মুজাদ্দিদ
অন্যায়, অবিচার, জুলম অত্যাচারের বিরুদ্ধে যিনি নির্ভীক মুজাহিদ, বীর সিপাহসালার
আতিথেয়তা, বদন্যতা, দানশীলতায় যিনি যুগের হাতেম তায়ী
আধ্যাত্মিক শের শায়েরীতে যিনি বাংলার রূমী
হুব্বে রাসুল, ইশকে রাসূলে যিনি বাংলার ওয়ায়েসুল করনী
ইয়াতীম, অনাথ, দুস্থ, দুর্গত, অসহায়ের যিনি পরম সুহৃদ, মহান অভিভাবক
জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের কল্যাণকামিতায়, সেবায় যিনি উৎসর্গিত প্রাণ
জ্ঞান, মনীষা, প্রজ্ঞা, পাণ্ডিত্যে এক বিস্ময়কর প্রতিভা
শরাফাত, সৌজন্য, উদারতা, মহানুভবতায় যিনি অনুপম

অগণিত জনতার হৃদয় রাজ্যের যিনি মুকুটহীন সম্রাট। তিনি ছিলেন ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ আল্লামা আবদুল লতীফ চৌধুরী (র.)।

ইসলাহে নফসের জন্য তিনি যেমন আজীবন চেষ্টা সাধনা করেছেন তেমনি গুরুত্বের সাথে ইসলাহে কওম ও হুকুমতের জন্যও চালিয়েছেন বিরামহীন জেদ্দ-জেহাদ।

সত্যিই তিনি–

শরীআতের হাদী, তরীকতের বাদশা
হাকীকতের খনি, মারিফত-শাহানশা
যুগের মুজাদ্দিদ, মুরাদে আউলিয়া
আশিকে ইলাহী, আশিকে মুস্তফা।।

তিলাওয়াতে কুরআন তথা ইলমে কিরাতের সনদ যেমন তাঁর রাসূলে মকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে পৌঁছেছে, তেমনি ইলমে হাদীস ও ইলমে তাসাউফের সনদও রাসূলুল্লাহ (সা.) পর্যন্ত পৌঁছেছে। আর এ তিনের সমন্বয়েই হলো দ্বীন। তাই তিনি দ্বীনের সত্যিকার রাহবার।

দ্বীনের এ তিন বিভাগের খিদমত আঞ্জাম তিনি শুধু ব্যক্তিগতভাবেই দেননি এজন্য তিনি উপযুক্ত কর্মীবাহিনী গড়ে তুলেছেন, সংগঠন কায়িম করেছেন, দুর্বার আন্দোলন সৃষ্টি করেছেন, বিভিন্ন দেশে ও মহাদেশে তা ছড়িয়ে দিয়েছেন। সর্বত্র সেসব সংগঠনের শাখা-প্রশাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী চলছে সত্যিকার দ্বীন কায়িমের সুমহান খিদমত।

সত্যিই নানা বিস্ময়কর ও বৈচিত্রে ভরপুর ছাহেব কিবলাহর জীবনালেখ্য। আমরা যেমন তাঁকে দেখতে পাই বিজন পার্বত্য–অরণ্যে গভীর ধ্যানমগ্ন সাধক রূপে, তেমনি দেখতে পাই ইসলামী আন্দোলন ও সংগ্রামের ময়দানে অকুতোভয় মুজাহিদ, অগ্রপথিক বীর সিপাহসালার রূপে। তাঁর এই দ্বিতীয় রূপটির কাহিনী সুদীর্ঘ। আমরা এখানে তার দুএকটি খণ্ড চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস পাচ্ছি। ইসলামী শিক্ষার খিদমতে তাঁর যেমন অপরিসীম অবদান রয়েছে, মুআল্লিম হিসাবে, মুহাদ্দিস হিসেবে, প্রিন্সিপাল হিসেবে, নিম্ন পর্যায় থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ের বহু মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা ও অভিভাবক হিসেবে, তেমনি অবদান রয়েছে এর মান উন্নয়নে এবং এ শিক্ষার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের পদক্ষেপের মোকাবিলায় জীবনবাজি রেখে সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়া ও নেতৃত্বদানের ক্ষেত্রে। এমন ঘটনা বহু। আমরা তার মধ্য থেকে এখানে কয়েকটি তুলে ধরছি।

১. তিনি ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত করিমগঞ্জের বদরপুর সিনিয়র মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। সেখানে তাঁর ছাত্র, ভক্ত, অনুরক্ত মুরীদ-মুতাকিদদের সংখ্যা বহু। ১৯৫১ সালে আসাম সরকার মুসলিম অ্যাডুকেশন বোর্ড বন্ধ করে দেয়। ছাহেব কিবলাহ সংবাদ পেয়ে এর বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়েন। এ সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে সে অঞ্চলে করতে থাকেন একের পর এক প্রতিবাদ সভা। আসাম সরকার এ আন্দোলন স্তব্ধ করার জন্য তার বিরুদ্ধে জারী করে গ্রেফতারি পরোয়ানা। তাতেও তিনি নিবৃত্ত না হয়ে গ্রেফতারি এড়িয়ে অব্যাহত রাখেন সভা-সমাবেশ। ক্ষেপে গিয়ে সরকার তাকে দেখামাত্র গুলির অর্ডার জারী করে। এ অবস্থাতেও তিনি এক প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত হয়ে হাতির পিঠে চড়ে জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিয়ে পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে জঙ্গলে আত্মগোপন করেন। গভীর অরণ্যে বহু লোমহর্ষক পরিস্থিতি ও কঠিন বিপদের মোকাবিলা করে অবশেষ উপস্থিত হন বদরপুরে এবং সেখান থেকে নিজ বাড়িতে।

২. পাকিস্তান আমলে ইসলামী অ্যাডভাইজারি কাউন্সিলের ডাইরেক্টর ড. ফজলুর রহমান প্রদত্ত ইসলামের অপব্যাখ্যার প্রতিবাদে দেশের উভয় অঞ্চলে ব্যাপক জন-অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। সিলেটে ছাহেব কিবলাহর নেতৃত্বে আহ্বান করা হয় এক বিক্ষোভ সমাবেশের। সিলেট নিবাসী পাক সরকারের জনৈক মন্ত্রী ছাহেব কিবলাহকে সমাবেশ না করার অনুরোধ করেন। ছাহেব কিবলাহ তাতে অসম্মতি জানালে মন্ত্রী মহোদয় ধমকের সুরে বলেন, বিক্ষোভ সমাবেশ স্থগিত করুন, অন্যথা সমাবেশের উপর পুলিশ গুলি বর্ষণ করবে। ছাহেব কিবলাহ দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, সমাবেশ অবশ্যই হবে। আপনারা পুলিশকে গুলির অর্ডার দিলে, ইনশাআল্লাহ আমিও ইসলামী ফৌজ নিয়ে তার যথার্থ মোকাবিলা করব। মন্ত্রী থ' হয়ে গেলেন। যথাসময়ে ছাহেব কিবলাহর নেতৃত্বে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই অত্যন্ত সফলভাবে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

বিপুল সংখ্যক সশস্ত্র পুলিশ সম্মুখের রাস্তা ঘিরে রেখেছে। নিরীহ মাদরাসা শিক্ষকগণ সামনে এগুতে ভয় পাচ্ছেন। শুরু হয়েও হচ্ছে না মিছিল যাত্রা। সামনে এসে দাঁড়ালেন ছাহেব কিবলাহ। মাথায় সেই সবুজ পাগড়ি, হাতে লাঠি, তেজদীপ্ত চেহারা, বললেন- চলো। এ মিছিলে সবার আগে থাকব আমি। যদি গুলি হয়, প্রথমে লাগবে আমার বুকে। আমি শহীদ হবো। সামনে আগাও। যেন এক বিদ্যুৎ প্রবাহ ছড়িয়ে গেল। মিছিল এগিয়ে চলল প্রধানমন্ত্রীর দফতর অভিমুখে।

৩. বাংলাদেশ আমলে এক সরকার কতিপয় অজুহাতে তিন শতাধিক মাদরাসা বন্ধ করে দেয়। চলে আরও অনেক মাদরাসা বন্ধের পায়তারা। এর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন রাজধানীর বায়তুল মোকাররামের দক্ষিণ চত্বরে সারাদেশের মাদরাসা শিক্ষকদের এক প্রতিবাদ সমাবেশ আহ্বান করে। যথা সময়ে হাজার হাজার মাদরাসা শিক্ষক জমায়েত হন বায়তুল মোকাররাম-সম্মুখ চত্তরে। জমিয়াতের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ছাহেব কিবলাহও যোগদান করেন সমাবেশে। সিদ্ধান্ত হয় প্রতিবাদ মিছিল নিয়ে যাওয়া হবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এবং পেশ করা হবে স্মারকলিপি। বিপুল সংখ্যক সশস্ত্র পুলিশ সম্মুখের রাস্তা ঘিরে রেখেছে। নিরীহ মাদরাসা শিক্ষকগণ সামনে এগুতে ভয় পাচ্ছেন। শুরু হয়েও হচ্ছে না মিছিল যাত্রা। সামনে এসে দাঁড়ালেন ছাহেব কিবলাহ। মাথায় সেই সবুজ পাগড়ি, হাতে লাঠি, তেজদীপ্ত চেহারা, বললেন- চলো। এ মিছিলে সবার আগে থাকব আমি। যদি গুলি হয়, প্রথমে লাগবে আমার বুকে। আমি শহীদ হবো। সামনে আগাও। যেন এক বিদ্যুৎ প্রবাহ ছড়িয়ে গেল। মিছিল এগিয়ে চলল প্রধানমন্ত্রীর দফতর অভিমুখে।

৪. প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের আমলে মাদরাসা শিক্ষকদের বৃহত্তর সংগঠন বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনকে ধ্বংসের পাঁয়তারা চলে। তা প্রতিহত করার জন্য সভাপতি মুহতারাম মাওলানা এমএ মান্নান বিজয় সরণিতে আহ্বান করলেন মাদরাসা শিক্ষকদের জাতীয় সম্মেলন। প্রেসিডেন্ট এরশাদ সম্মতি দিলেন সম্মলনে প্রধান অতিথি হিসাবে যোগদান করতে। বিশেষ অতিথি ছারছীনার পীর ছাহেব কিবলাহ ও ফুলতলীর ছাহেব কিবলাহ। লক্ষাধিক মাদরাসা শিক্ষকদের সেই জাতীয় সমাবেশে মহামান্য প্রেসিডেন্টের ডানে ও বামে বসলেন দুই যুগশ্রেষ্ঠ আল্লাহর ওলী। ছাহেব কিবলাহ তাঁর ভাষণের এক পর্যায়ে বললেন : 'প্রেসিডেন্ট সাহেব! জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের উপর হাত দিবেন না, ওটা আমাদের সংগঠন। কেউ ওটা ভাঙ্গার চেষ্টা করলে তার পরিণতি শুভ হবে না।'

৫. ২০০৫ সনে মাদরাসা শিক্ষাধারার ফাজিল, কামিল স্তর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। আশঙ্কা সৃষ্টি হলো এতে মাদরাসা শিক্ষা তার স্বকীয়তা হারিয়ে এক সময়কার নিউস্কীম মাদরাসার পরিণতি বরণ করার। সারাদেশে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উঠল। ছাহেব কিবলাহর প্রতিবাদ কার্যক্রম শুধু সিলেটেই সীমাবদ্ধ থাকল না। তিনি এর প্রতিবাদে সিলেট-ঢাকা লং মার্চ করার ঘোষণা দিলেন। তিনি ছয় শতাধিক গাড়ির এক বিরাট বহর নিয়ে যথা সময়ে পৌঁছলেন ঢাকার বায়তুল মোকাররাম মসজিদের উত্তর গেটে। শাপলা চত্বর থেকে সচিবালয়ের পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত জনসমুদ্রে পরিণত হলো। ছাহেব কিবলাহ (র.) হায়দরী হুঙ্কারে বললেন : বাতিল কর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মাদরাসাসমূহকে ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত। কায়িম করো ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়। আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হোক ফাযিল, কামিল স্তর। অন্যথায় কেবল সিলেট থেকে নয়, সকল বিভাগ ও জেলা থেকে লংমার্চ হবে ঢাকা অভিমুখে। প্রতিক্রিয়া হলো সরকারি মহলে, ছাহেব কিবলাহকে আহ্বান জানানো হলো ঢাকায় এসে একান্তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করার। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করলেন প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব আবুল হারিস চৌধুরী। সিদ্ধান্ত হলো, ছোট ছাহেব জনাব মাওলানা হুছামুদ্দীন চৌধুরী এবং আমি যাব ছাহেব কিবলাহর সাথে। বৈঠক হলো প্রধানমন্ত্রীর সাথে। ছাহেব কিবলাহ উপদেশমূলক অনেক কথা বলার পর বললেন, মাদরাসাগুলো সরকার কায়িম করেনি, কায়িম করেছেন পীর-মাশায়েখগণ তাদের অনুসারী অনুগামী দ্বীনদার মুসলমানদের সহায়তা নিয়ে। এগুলোকে স্কুল, কলেজে পরিণত করবেন না। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এগুলোকে ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত বাতিল করুন। ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে মাদরাসাগুলোকে তার অধীনে ন্যস্ত করুন। এ শিক্ষার উন্নয়নের বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। ছাহেব কিবলাহ সতর্ক করে দিয়ে বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধানের খেলাফ করলে তাঁরা অসন্তুষ্ট হন। গযব নেমে আসে।

'স্বৈরাচারী শাসকের সামনে হককথা বলা হচ্ছে সর্বোত্তম জিহাদ'। এ জিহাদ চালিয়ে গেছেন তিনি আজীবন, আমরণ। সহীহ আকীদা, আমল, প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং বাতিল আকীদা ও আমল উৎখাত করার জিহাদে তিনি নিজ জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। এ পথে শহীদ হওয়ার তামান্না ব্যক্ত করেছেন। নিয়ত সংগ্রাম করেছেন, কঠিনতর বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন। জীবন বিপন্ন হওয়ার মুখোমুখি হয়েছেন। তবু সত্য-ন্যায়ের ঝান্ডাকে বুলন্দ রেখেছেন, কখনো অবনত হতে দেননি।

ছাহেব কিবলাহ দ্বীনী খিদমত সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দেওয়ার লক্ষ্যে দেশে ও বিদেশে বহু প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন কায়িম করে গেছেন। তন্মধ্যে দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্ট, লতিফিয়া এতীমখানা, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, লতিফিয়া কমপ্লেক্স, বাংলাদেশ আনজুমানে মাদারিছে আরাবিয়া, বাংলাদেশ আনজুমানে আল ইসলাহ, লতিফিয়া কারী সোসাইটি, বাংলাদেশ আনজুমানে তালামীযে ইসলামিয়া, ইয়াকুবিয়া হিফযুল কুরআন বোর্ড, দারুল হাদীস লতিফিয়া ইউকে, আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে, লতিফিয়া উলামা সোসাইটি ইউকে, লতিফিয়া কারী সোসাইটি ইউকে, আল ইসলাহ ইয়ুথ ফোরাম, কিরাত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, আল-মজিদিয়া ইভিনিং মাদরাসা ও লতিফিয়া গার্লস স্কুলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় দেশে-বিদেশে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অনেক।

ছাহেব কিবলাহ (র.) অনেক দ্বীনী গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তন্মধ্যে আততানভীর আলাত-তাফসীর, মুন্তাখাবুস সিয়র, আনওয়ারুছ ছালিকীন, আল খুতবাতুল ইয়াকুবিয়া, নালায়ে কলন্দর, শাজারায়ে তায়্যিবাহ, নেক আমল, আল-কাওলুছ ছাদীদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তিনি তালামীযে ইসলামিয়া নামে যে ছাত্র সংগঠন কায়িম করেছেন মাদরাসা, স্কুল, কলেজ, ভার্সিটি পর্যায়ে তার ব্যাপক প্রসার ঘটছে।

তিনি ইলমে কিরাতের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছেন 'দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্ট' নামে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। সদ্য প্রাপ্ত তথ্যমতে বিভিন্ন দেশ ও মহাদেশে রয়েছে তার প্রায় তিন হাজার শাখা। যার মধ্যে বাংলাদেশে ২২৩২টি, ইউকেতে ৫৪টি। এ ছাড়া ভারত, স্পেন, কুয়েত, ফ্রান্স ও আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটে রয়েছে আরও অনেক শাখা। দারুল কিরাতের রয়েছে ৬টি শ্রেণি। ২০১৯ সালের হিসেব অনুযায়ী এর সর্বমোট ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ৪,৭৩,৫৪৭ জন। শিক্ষক সংখ্যা ১৩,৬১২ জন। শাখাকেন্দ্রসমূহের সাথে জড়িত রয়েছেন ২৪,৩৩২ জন নিবেদিত প্রাণ সদস্য।

ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) আর্ত-মানবতার সেবায় নিবেদিত ছিলেন আজীবন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত বড় ছাহেব কিবলাহ এবং তাঁর অন্যান্য আওলাদও তাঁদের ভক্ত অনুসারীদের নিয়ে এ খিদমত সমগুরুত্বের সাথে অব্যাহত রেখেছেন। সম্প্রতি তাঁরা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সেবা ও খিদমতে এক অনন্য দৃষ্টান্ত কায়িম করেছেন। এসব অত্যাচারিত, নিগৃহীত, নিপীড়িত উদ্বাস্তুদের অব্যাহতভাবে খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা দিয়ে যেমন মানবতার মহৎ নজীর স্থাপন করা হয়েছে তেমনি সেখানে ৫০টি শাখা কেন্দ্র স্থাপন করে ১২০ জন কারী সাহেবানের মাধ্যমে চালানো হচ্ছে পবিত্র কুরআনের তালীম ও প্রাথমিক দ্বীনী শিক্ষা কার্যক্রম।

সিলেটসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায়, যুক্তরাজ্যের লন্ডন, ম্যানচেস্টার, বার্মিংহাম, ব্রিস্টল, ওয়েলসের কার্ডিফ ও স্কটল্যান্ডের বিভিন্ন শহরে এবং যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক, ম্যানহাটন, জামাইকা ও নিউজার্সি, মিশিগান, ওয়াশিংটন ডিসিসহ বিভিন্ন স্টেটের বিভিন্ন শহরে দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্ট এর কর্মীদের তথা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) এর ভক্ত, অনুরাগী, অনুসারীদের যে স্বতঃস্ফূর্ত দ্বীনী খিদমত ও মানবতার সেবা আমি স্বচক্ষে দেখেছি এক কথায় তা নজিরবিহীন।

ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) সম্পর্কে কিছু আলোচনা করতে গেলেই আল্লামা আলতাফ হুসাইন হালীর মুসাদ্দাসের কায়েকটি চরণ আমার মনে পড়ে যায় এবং প্রায়ই তা আবৃত্তি করে তৃপ্তি পাই। যার তরজমা হচ্ছে,

"উল্টে দিতে যুগ-জমানা চাই না অনেক জন
এক মানুষই আনতে পারে জাতির জাগরণ।
এক মানুষই বিপদ কালে বাঁচায় কাফেলায়
ক্ষুদ্র ডিঙ্গা বাঁচায় জাহাজ অসীম দরিয়ায়।
এমনি করে চলছে হেথায় রাত্রি দিন ও মান
একটা বাতি জ্বালতে পারে হাজার বাতির প্রাণ।"

ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) এর প্রচেষ্টা ও তত্ত্বাবধানে দেশে-বিদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিভিন্ন স্তরের বহু মাদরাসা, মক্তব, মসজিদ, খানকা, ইয়াতীমখানা ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। দেশ-দেশান্তরে সম্প্রসারিত হয়ে চলছে এর সংখ্যা ও খিদমত। তাঁর প্রণীত গ্রন্থাবলি দ্বারা ইলমে দ্বীনের আলো, মানবতার আহ্বান ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্বময়। সৃষ্টি হচ্ছে এক আধ্যাত্মিক জাগরণ। ইন্তিকালের পরেও তার রূহানী ফয়েয ও তাওজ্জুহতে ধন্য হচ্ছে বহু জন। তাঁর অমর অবদান নিয়ে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানে চলছে গবেষণা। আমরা মনে করি, রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও তাঁর মূল্যায়ন হওয়া আবশ্যক। গুণীজনে কদরদানে উদার সরকার এ দিকে নজর দিবে– এ আমাদের প্রত্যাশা।

তাঁর কাশফ ও কারামতের ঘটনা অসংখ্য। মরেও যারা অমর হয়ে থাকেন ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ হচ্ছেন তাঁদেরই একজন। ইন্তিকালের পরেও রূহানী শক্তিবলে যারা পথ নির্দেশ করতে পারেন, ছাহেব কিবলাহ হলেন তেমনি এক আধ্যাত্মিক ক্ষমতা সম্পন্ন মহাপুরুষ। এরূপ ঘটনা আছে বহু। সে সব তুলে ধরা এ নিবন্ধের লক্ষ্য নয়। তবু, আমার নিজ সম্পর্কিত একটি ছোট ঘটনা উল্লেখ করার ইচ্ছে দমিয়ে রাখতে পারছি না। আমি তখন ইউকে সফরে। অবস্থান করছি ইস্ট লন্ডনের একটি বাড়িতে। ফজরের নামাজান্তে মুসল্লায়ই বসে আছি। হঠাৎ এসময় হাজির হলেন ছাহেব কিবলাহর স্বনামধন্য নাতি, লন্ডনস্থ দারুল হাদীস লতিফিয়ার সুযোগ্য প্রিন্সিপাল মাওলানা মুহাম্মদ হাসান চৌধুরী। এত ভোরে তাঁর আগমনে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম আগমনের হেতু। তিনি বললেন, বহুদিন ধরেই দাদাছাব স্বপ্নে দর্শন দিচ্ছিলেন না। কিন্তু আজ রাতে তাঁকে দু'দুবার দেখলাম। প্রথমবার দেখলাম, তিনি তাশরীফ এনেছেন। আমাকে বলছেন : রূহুল আমীন ছাব তো কদিন হয় লন্ডনে এসেছেন। তার খবর নিয়েছ কি? তাকে দাওয়াত দিয়েছ? আপ্যায়ন করেছ? আমি হন্তদন্ত হয়ে বিছানায় উঠে বসলাম। আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। আবার দেখলাম হুবহু ঐ একই স্বপ্ন। আর ঘুমুতে পারিনি। ফজর নামাজ আদায় করেই এখানে আপনার কাছে চলে এলাম। স্বপ্নের বিবরণ শুনে আমি কেঁদে ফেললাম। আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানালাম, দুনিয়াতে যেমন তিনি এ অধমকে ভুলেননি, হাশরের ভয়াল দিনেও তেমনি যেন ভুলে না যান।

ফিকহ ও হানাফী মাযহাবের ভিত্তিমূল

মো. মুহিবুর রহমান

আল্লাহ তাআলা মানুষ সৃষ্টি করে তাদের হিদায়াতের জন্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। নবীদের দাওয়াতে প্রজ্জ্বলিত হিদায়াতের প্রদীপ ঈসায়ী ষষ্ঠ শতাব্দীতে এসে নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিল। মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত সরল পথ বাদ দিয়ে প্রবৃত্তির অনুসরণ ও ভোগ-বিলাসে নিজেদের সঁপে দিয়ে ঘোর অমানিশায় ছিল নিমজ্জিত। ইতিহাসের সেই ক্রান্তিলগ্নে আল্লাহ মানবতাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে ধরার বুকে পাঠালেন সায়্যিদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে হিদায়াতের নূর হিসেবে মানুষকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন। তাঁর উপর অবতীর্ণ কিতাব আল-কুরআন (ওহী মাতলু) এবং তাঁর কথা, কাজ ও মৌন সম্মতি তথা আস-সুন্নাহ (ওহী গাইরু মাতলু) হচ্ছে সর্বযুগের মানুষের জীবন চলার পাথেয়। কুরআন-সুন্নাহ থেকে মানবজীবনের বিধানাবলি সুবিন্যস্তরূপে সাজানোর পদ্ধতিই হলো ইলমে ফিকহ।

'আল-ফিকহ' অর্থ হল- জানা, বুঝা, হৃদয়ঙ্গম করা, তীক্ষ্ণ উপলব্ধি ও গভীর বোধ ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবীগণের যুগে 'ফিকহ' শব্দ দ্বারা দীন ও শরীআতের ইলমকে বুঝানো হতো। কুরআন ও হাদীসের জ্ঞানে সমঝদার ব্যক্তিকে 'ফকীহ' বলার প্রচলন ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ.

-ইলমে দীনের অনেক বাহক তার অপেক্ষা অধিক সমঝদার লোকের নিকট তা পৌঁছে দেন। আর ইলমে দীনের অনেক বাহকই নিজেরা সমঝদার নন। (সুনানু আবি দাউদ, কিতাবুল ইলম, বাবু ফাদলি নাশরিল ইলম, হা: ৩৬৬২)। রাসূলুল্লাহ (সা.) অন্যত্র বলেন,

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ

-"আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে তিনি দীনের ফিকহ (সঠিক উপলব্ধি) দান করেন"। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল ইলম, হা: ৭১; সহীহ মুসলিম, হা: ২৪৩৬)।

ফিকহ শব্দের এ অর্থটি ব্যাপকতাজ্ঞাপক। এতে আকীদা, আখলাক, তাযকিয়াতুন নাফস, মুআমালাতসহ দীনের সকল বিষয়ই ফিকহের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এ কারণেই ইমাম আবূ হানীফা (র.) ফিকহের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে- مَعْرِفَةُ النَّفْسِ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا -"ফিকহ হচ্ছে নাফসের জন্য কোনটি উপকারী এবং কোনটি অপকারী তা সম্যক অবগত হওয়া।" (আব্দুল আযীয আল বুখারী, কাশফুল আসরার, খ. ১, পৃ. ১১)। আর এ কথা সর্বজনবিদিত যে, তিনি তাঁর আকীদা বিষয়ক কিতাবের নাম রেখেছেন 'আল-ফিকহুল আকবার'।

কুরআন ও সুন্নাহর পাশাপাশি ফিকহ শব্দের পৃথক ব্যবহার সাহাবায়ে কিরামের যুগ থেকেই লক্ষ্য করা যায়। যেমন, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يُعَلِّمُ فِيْهِ الْقُرْآنَ وَالْفِقْهَ وَالسُّنَّةَ.

-"শ্রেষ্ঠ জিহাদ হলো, যে ব্যক্তি একটি মসজিদ তৈরি করল, যেখানে তিনি কুরআন, ফিকহ ও সুন্নাহর শিক্ষা দান করেন।" (কুরতুবী, আল-জামিউ লি আহকামিল কুরআনিল কারীম, খ. ৮, পৃ. ২৯৬)।

কালের পরিক্রমায় ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রকাশ পেতে থাকে। শেষ পর্যায়ে এসে ফিকহ শব্দটি ইসলামী আইনের সমার্থক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

ইলমুল ফিকহ হলো ওহী নির্ভর একটি আইনী ব্যবস্থাপনা। পবিত্র কুরআন, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সুন্নাহ ও সাহাবীগণের বক্তব্যের মাধ্যমে ফিকহশাস্ত্রের ভিত্তি নির্মিত হয়েছিল। তখন ইসলামী আইনের একমাত্র উৎস ছিল আল-কুরআন ও আস-সুন্নাহ। কেননা যখনই কোনো সমস্যার উদ্ভব হতো বা কোনো মাসআলা জানার প্রয়োজন পড়ত, সাহাবীগণ তখনই রাসূলুল্লাহ (সা.) এর শরণাপন্ন হতেন। তিনি কুরআন থেকে অথবা স্বীয় সুন্নাহর আলোকে তাদের জিজ্ঞাসার জবাব দিতেন। পরবর্তীতে সাহাবাযুগে কুরআন বা সুন্নাহে কোনো মাসআলার সুনির্দিষ্ট সমাধান খুঁজে পাওয়া না গেলে বিশিষ্ট সাহাবীগণের বৈঠক হতো। মাসআলার সমাধানের ব্যাপারে বৈঠকে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করা হতো। এ ধরনের ঐকমত্যকে 'ইজমা' বলা হয়। ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা না হলে অধিকাংশ সাহাবীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার প্রয়াস লক্ষণীয়। সংখ্যাগরিষ্ঠতা নির্ণয় সম্ভব না হলে খলীফা ইজতিহাদ (কিয়াস) করতেন এবং তা আইন হিসাবে সবাই মেনে নিতেন। ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব না হলে সাহাবীগণ পরস্পরের মতামতকে সম্মান করতেন।

আবূ বকর (রা.) এর খিলাফতকালে একবার তাঁকে 'কালালাহ' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। এ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই। তাই তিনি বললেন,

إِنِّي سَأَقُوْلُ فِيْهَا بِرَأْيِيْ فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ أُرَاهُ مَادُوْنَ الْوَالِدِ وَالْوَلَدِ

-"আমি আমার মত অনুসারে ইজতিহাদ করব। যদি সঠিক হয়, তাহলে এটা হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে; আর ভুল হলে, তা হবে আমার পক্ষ থেকে এবং শয়তানের পক্ষ থেকে। আমার মনে হয়, 'কালালাহ' বলতে ঐ ব্যক্তিকে বুঝানো হয়, যার মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারী হিসেবে পিতা থাকে না, পুত্রও থাকে না।" (সুনানুদ দারিমী, কিতাবুল ফারাইদ, বাবুল কালালাহ, খ. ২, পৃ. ৪৬২, হা: ২৯৭২; ইবনুল কাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন, খ. ১, পৃ. ১০৫)।

অতঃপর উমর (রা.) খিলাফতের আসন অলংকৃত করেন। তিনি 'কালালাহ' এর ব্যাখ্যায় আবূ বকর (রা.) এর ইজতিহাদ সম্পর্কে বলেন,

إِنِّي لَأَسْتَحْيِي اللهَ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا قَالَهُ أَبُوْ بَكْرٍ

-"আমি আল্লাহর কাছে লজ্জাবোধ করছি যে, আবূ বকর (রা.) একটি কথা বলেছেন আর আমি তা প্রত্যাখ্যান করব।" (প্রাগুক্ত)

এভাবে আরও অনেক উদাহরণ পর্যালোচনা করলে এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয় যে, প্রথম খলীফা আবূ বকর (রা.)-এর শাসনামল থেকেই ইলমে ফিকহের চারটি উৎস তথা (১) কুরআন, (২) হাদীস, (৩) ইজমা (৪) কিয়াস অনুযায়ী শরীআতের

বিধান নির্ধারণের পদ্ধতি কার্যকর ছিল। তাঁর পরবর্তী খলীফাগণ এবং সাহাবা-তাবেয়ী যুগের ফুকাহাগণ এই পদ্ধতিতেই ফতোয়া দিতেন। আরও কিছু উদাহরণের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যেমন- দাদার মীরাস সম্পর্কে আবূ বকর (রা.) দাদাকে পিতার উপর কিয়াস করে বলেন, মীরাসের ব্যাপারে পিতার অবর্তমানে দাদার হুকুম পিতার মতোই। উমর (রা.) ইজতিহাদ করে যাকাত প্রদানের অন্যতম খাত 'মুআল্লাফাতুল কুলুব'দের অংশ বন্ধ করে দেন, দুর্ভিক্ষের বছর চোরের হাত কাটার বিধান স্থগিত করেন, স্বামী নিরুদ্দেশ হয়েছে এমন নারীকে চার বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাকে নতুন করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অনুমতি দেন। হাদীস ও ফিকহ বিষয়ে যারা সামান্য জ্ঞান রাখেন, তাদের কাছে মুআয বিন জাবাল (রা.) এর ঘটনা তো খুবই প্রসিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন তাঁকে ইয়ামান প্রেরণ করেন, তখন বিচারের ফায়সালার পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। জবাবে মুআয (রা.) বলেছিলেন, সমাধান খুঁজব প্রথমে কুরআনে, কুরআনে না পেলে সুন্নাহে, সুন্নাহে না পেলে আমার 'রায়' অনুসারে ইজতিহাদ করবো; এই জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) খুশি হয়ে তাঁর বুকে হাত রেখে আল্লাহর প্রশংসা করেছিলেন। প্রবন্ধের কলেবর সংক্ষেপ করার স্বার্থে বিস্তারিত না বলে কেবল ইঙ্গিত করা হলো। এরকম হাজারো নমুনা ফিকহ ও উসূলের কিতাবসমূহে জ্বলজ্বল করছে। আজ যারা ফিকহের উৎসসমূহ নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালায়, তাদের কি একটুও ফুরসত নেই যে, তারা সাহাবীদের ফিকহী মানহাজ নিয়ে একটু গবেষণা করবে?

ইসলামী খিলাফতের সীমানা বৃদ্ধির সাথে সাথে নতুন নতুন অঞ্চলে ইসলামী শিক্ষা দেওয়ার তাগিদে ফকীহ সাহাবীগণ (রা.) বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েন। উসমান (রা.) এর শাহাদাতের পর সাহাবীদের বিভিন্ন অঞ্চলে পাড়ি জমানোর মাত্রা বেশি লক্ষ্য করা যায়। যে অঞ্চলে যে সাহাবী গিয়েছেন, সে অঞ্চলে তাঁর ইজতিহাদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। অনেক মাসআলায় মতপার্থক্য তৈরি হলেও সবাই পরমতসহিষ্ণু ছিলেন।

তৎকালে মদীনায় ফিকহী মাসআলা সমাধানের প্রধান দায়িত্ব পালন করতেন আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রা.) ও যায়দ ইবনু সাবিত (রা.)। মক্কায় আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) এর নেতৃত্বে ফিকহী তালীম ও ফতোয়া প্রদানের কাজ চলতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ইরাকের কুফায় ফিকহ ও ফাতাওয়ার দায়িত্ব পালন করতেন আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.)। দ্বিতীয় খলীফা উমর (রা.) তাঁকে কুফার মুফতী ও গভর্নর করে পাঠান।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) এর শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আলকামাহ ইবনু কাইস, মাসরুক ইবনুল আজদা (রা.)। তাঁদের মৃত্যুর পর কুফার ফিকহী দায়িত্ব পালন করেন, কাযী শুরাইহ, উবাইদাহ আস-সালমানী, আল-আসওয়াদ ইবনু ইয়াযিদ আন-নাখয়ী, ইবরাহীম আন-নাখয়ী, আমির ইবনু শুরাহবিল আশ-শা'বী প্রমুখ বিজ্ঞ ফকীহবৃন্দ।

আমির ইবনু শুরাহবিল আশ-শা'বী (রা.) এর কাছ থেকে যারা ফিকহ শিক্ষা অর্জন করেন তাদের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা নু'মান ইবনু সাবিত (র.) অন্যতম। আমির আশ-শা'বীর মৃত্যুর পর ইমাম আবূ হানীফা (র.) ইলম অর্জনের জন্য প্রসিদ্ধ ফকীহ তাবেয়ী ইবরাহীম আন-নাখয়ী (র.) এর বিশিষ্ট ছাত্র হাম্মাদ ইবনু আবী সুলাইমান (র.) এর সান্নিধ্য গ্রহণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর ইমাম আবূ হানীফা (র.) তাঁর উস্তাযের দারসের আসনে সমাসীন হন। তিনি কুরআন-সুন্নাহর দলীল বিশ্লেষণ করে ফিকহী মাসাঈল উদঘাটনের ক্ষেত্রে যে বিচক্ষণতার পরিচয় দেন, তাতে তাঁর সুনাম দিক-বিদিক ছড়িয়ে পড়ে। ইলম পিপাসু নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিবর্গ তাঁর দারসে বসতেন। তন্মধ্য থেকে সুযোগ্য ও বিশিষ্ট ছাত্রদের নিয়ে ৪০ সদস্যের একটি ফিকহী বোর্ড গঠন করেন। এ বোর্ডের সদস্যদের মধ্যে অন্যতম হলেন, ইমাম যুফার, ইমাম আবূ ইসমাহ, ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ-শাইবানী ও ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু সায়ীদ আল-কাত্তান (র.) প্রমুখ। আর এই বিশেষজ্ঞ ফকীহগণের বোর্ডই 'হানাফী মাযহাব' হিসাবে পরিচিত। এই বোর্ডে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর তত্ত্বাবধানে ফিকহী গবেষণা চলত। একাডেমিক তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনা-পর্যালোচনা করে একটা সিদ্ধান্তে আসলে তা লিপিবদ্ধ হতো।

পরিশেষে বলব, ইলমুল ফিকহ হচ্ছে কুরআন-সুন্নাহর নির্যাস। হানাফী মাযহাব কোনো ব্যক্তি বিশেষের একক সিদ্ধান্তের উপর গড়ে ওঠেনি। একদল তীক্ষ্ণ মেধাবী ও বিজ্ঞ মুজতাহিদের গবেষণালব্ধ ফতোয়ার সমষ্টিই হল হানাফী মাযহাব। হানাফী মাযহাবের বিশেষ অবদান হল উপপ্রমেয়মূলক (Hypothetical) বিষয়ে ইজতিহাদ অর্থাৎ যেসব বিষয় এখনও সংঘটিত হয়নি, ভবিষ্যতে সংঘটিত হতে পারে-এমন বিষয়ে ইজতিহাদ করে সিদ্ধান্তে পৌঁছা। এই কারণে অন্যান্য মাযহাবের তুলনায় এই মাযহাবের মাসআলার সংখ্যা বেশি। এই মাযহাবের ফকীহদের গবেষণার ফলাফল স্বরূপ প্রথম যুগেই ৮৩ হাজার মাসআলার সমাধান মুসলিম উম্মাহর হাতে আসে। পর্যায়ক্রমে এই সংখ্যা বাড়ছে। বর্তমানে হানাফী মাযহাবের মাসআলার সংখ্যা কয়েক লাখ ছাড়িয়েছে। ধারাবাহিক গবেষণা এখনো চলমান। কিয়ামত পর্যন্ত যেকোনো উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শরয়ী সমাধান পেতে ফিকহে হানাফীর উসূল খুবই প্রয়োজনীয়। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, যারা মাযহাব মানে না, তাদের অনেককেই দেখা যায় যে, আধুনিক কোনো বিষয়ে গবেষণামূলক কাজ করতে হলে হানাফী মাযহাবের কিতাবসমূহের দ্বারস্থ হচ্ছেন! আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের বুঝার তাওফীক দান করেন। আমীন।

বাংলা জাতীয় মাসিক
পরওয়ানা
বিজ্ঞাপনের হার

শেষ প্রচ্ছদ (চার রং)	৪০,০০০/-
২য় ও ৩য় প্রচ্ছদ (চার রং)	৩০,০০০/-
ভিতরের পূর্ণ পৃষ্ঠা (সাদা কালো)	১৮,০০০/-
ভিতরের অর্ধ পৃষ্ঠা (সাদা কালো)	১০,০০০/-
ভিতরের সিকি পৃষ্ঠা (সাদা কালো)	৬,০০০/-
ভিতরের পূর্ণ পৃষ্ঠা (চার রং)	২৫,০০০/-
ভিতরের অর্ধ পৃষ্ঠা (চার রং)	১২,০০০/-
ভিতরের এক কলাম ৩" ইঞ্চি (সাদা কালো)	৩,০০০/-

বি. দ্র: একসাথে তিন মাসের জন্য ২৫%, ছয় মাসের জন্য ৩৫% ও এক বছরের জন্য ৫০% ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে।

যোগাযোগ
বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
মাসিক পরওয়ানা
মোবাইল: ০১৭৯৯৬২৯০৯০

প্রবন্ধ

ধর্মের অবমাননায় মুসলিমদের প্রতিক্রিয়া কেমন হওয়া উচিত?

মাবরুর মাহমুদ

মাত্র কিছুদিন আগে ফ্রান্স সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ব্যঙ্গচিত্র জনসমক্ষে প্রকাশের কারণে সারা মুসলিম বিশ্বে রীতিমতো তোলপাড় হয়েছে। প্রতিটি মুসলিম দেশের নাগরিক সম্মিলিতভাবে বা ব্যক্তিগত পর্যায়ে এই কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করেছেন। অনেক মুসলিম দেশের সরকারপ্রধান এই আচরণের প্রতিবাদ জানিয়েছেন। অনেক রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ রাজপথের কর্মসূচির মাধ্যমে তাদের মনের ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে নিয়ে ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শন বা অবমাননা এটাই প্রথম নয়। এই ধরনের ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশের প্রবণতা প্রথম শুরু হয়েছিল ডেনমার্কের Jyllands Posten পত্রিকাটির মাধ্যমে। ২০০৫ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর এই পত্রিকাটি হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে নিয়ে ১২টি ব্যঙ্গাত্মক কার্টুন প্রকাশ করে। এই সংবাদ যখন মুসলিম বিশ্বে জানাজানি হয়, তখন সারা মুসলিম জাহান এই আচরণের প্রতিবাদে ক্ষোভে ফেটে পড়েছিল।

ডেনমার্কের পত্রিকাটির মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের অবমাননার যে প্রবণতা শুরু হয়েছিল, তারই ধারাবাহিকতায় ২০০৬ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি ফ্রান্সের স্যাটায়ার পত্রিকা Charlie Hebdo ডেনমার্ক থেকে প্রকাশিত কার্টুনগুলো আবারো প্রকাশ করে এবং সেই সাথে তাদের নিজেদের আঁকা আরো কয়েকটি কার্টুনও যুক্ত করে।

পত্রিকাটি হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে নিয়ে ব্যঙ্গ করার ধারাবাহিকতায় ২০১১ সালে এই রকম আরো একটি ব্যঙ্গাত্মক প্রচারণা চালায়। প্রতিক্রিয়ায় অফিসে বোমা হামলা হয় এবং পত্রিকাটির ওয়েবসাইট হ্যাক করা হয়। ২০১২ সালেও ব্যঙ্গাত্মক কার্টুন প্রকাশের এই ধারা বজায় ছিল ।

সে সময় হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে নিয়ে এই ধরনের কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ শুধুমাত্র মুসলিমদের পক্ষ থেকেই আসেনি, প্রতিবাদ এসেছে বিশ্বের ক্ষমতাধর দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের পক্ষ থেকেও। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাও প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। তবে ২০১৫ সালের ৭ জানুয়ারি দুইজন বন্দুকধারী পত্রিকাটির অফিসে ঢুকে এলোপাথাড়ি গুলি করে পত্রিকাটির দুইজন সম্পাদকসহ মোট ১২ জনকে হত্যা করলে দৃশ্যপট পুরোপুরি পাল্টে যায়। ঘটনার বিবরণ থেকে জানা যায়, এই দুই বন্দুকধারী গুলি করার সময় "আল্লাহু আকবার" বলে চিৎকার করেছিল। তারা ছিল পরস্পর ভাই এবং আলজেরিয়ান বংশোদ্ভূত ফরাসি নাগরিক। নৃশংস হত্যাকাণ্ডটির কারণে রাতারাতি বিশ্ব জনমত চলে যায় মুসলিমদের বিপক্ষে। এর পূর্ব পর্যন্ত অনেকেই ফ্রি প্রেসের সুযোগ নিয়ে পত্রিকাটির এই ধরনের কার্টুন প্রকাশের বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু মুসলিমরা এর প্রতিক্রিয়ায় হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে ফেললে, সাধারণ মানুষের সহানুভূতি হারায়। যারা এর আগে মুসলিমদের পক্ষে ছিলেন, তারাও এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়ে Charlie Hebdo এর পক্ষাবলম্বন করেন। ফলে পত্রিকাটির জনপ্রিয়তা রাতারাতি কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায়। এর আগ পর্যন্ত পত্রিকাটি প্রতিদিন ৬০,০০০ কপি ছাপা হতো। কিন্তু ২০১৫ সালের ১৩ জানুয়ারি হত্যাকাণ্ড পরবর্তীতে পত্রিকাটির প্রথম যে কপি ছাপা হয়েছিল, তা প্রায় ৫০ লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছিল। শুধু তাই নয়, এই পত্রিকাটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায় থেকে বিভিন্ন অনুদানের ঘোষণা দেওয়া হয়।

সাংবাদিক-পেশাজীবীরা পত্রিকাটির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে "আমি শার্লি" (I am Charlie) রাস্তায় মিছিল করেন। এই স্লোগানটি তখন মুখে মুখে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। অথচ মুসলিমদের পক্ষ হতে এই দুই ভাই নিজেদের হাতে আইন তুলে নিয়ে এরকম একটি হত্যাকাণ্ড যদি না ঘটাত তাহলে বিশ্ব জনমত এভাবে পত্রিকাটির পক্ষে চলে যেত না।

যাই হোক, ঘটনার শেষ এখানে হলেই ভালো ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তা হয়নি। ২০২০ সালে স্যামুয়েল প্যাটি নামক এক ফরাসি স্কুল শিক্ষক তার ক্লাসে শিক্ষার্থীদেরকে ফ্রি প্রেসের উদাহরণ দেখাতে গিয়ে শার্লি হেবদো'র আঁকা কার্টুনগুলো প্রদর্শন করেন। এই সংবাদ একজন দুজন করে ফ্রান্সের মুসলিম সমাজে খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং এরই প্রতিক্রিয়ায় ফরাসি বংশোদ্ভূত এক চেচেন নাগরিক কয়েকদিন পর স্যামুয়েল প্যাটিকে হত্যা করে। হত্যাকাণ্ডটির প্রতিবাদে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট Emmanuel Macron প্রকাশ্যে ইসলাম ধর্মের বিপক্ষে অবস্থান নেন। এরই ধারাবাহিকতায় তার দেশের সরকারের ফ্রি প্রেসের নীতিকে সমর্থন জানাতে একটি সরকারি বিল্ডিংয়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর কার্টুনগুলো আবারো জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়। মুসলিম বিশ্বে ইসলাম ধর্মের অবমাননা নিয়ে সম্প্রতি বিশ্বব্যাপী যে ব্যাপক বিক্ষোভ এবং প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে, এর নেপথ্যের মূল ঘটনা এটাই।

ঘটনার প্রতিবাদে মুসলিম অধ্যুষিত বিভিন্ন দেশে ফ্রান্সের পণ্য বয়কটের ডাক দেওয়া হয়। ফলে মধ্যপ্রাচ্যের যে সকল দেশে ফ্রান্সের পণ্যের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে, সেই সকল দেশের জনগণ ফ্রান্সের পণ্য বয়কট করা শুরু করে। অনেক সুপার মার্কেট কর্তৃপক্ষ তাদের ভোক্তাদের ধর্মীয় অনুভূতিকে সম্মান জানিয়ে ফ্রান্সের পণ্য শেলফে প্রদর্শন করা থেকে বিরত থাকে।

পণ্য বয়কটের প্রকৃত ফলাফল যাই হোক, কিছুদিন পরেই ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট তার সুর পরিবর্তন করতে বাধ্য হন। তিনি মধ্যপ্রাচ্যের জনপ্রিয় চ্যানেল আল-জাজিরাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, তিনি মুসলিমদের আবেগ-অনুভূতিকে সম্মান করেন। ফলে মুসলিমদের মধ্যে এক ধারণার সৃষ্টি হয় যে, পণ্য বয়কটে বেশ ভালো কাজ হয়েছে।

পণ্য বয়কট কি সমাধান?

ইসলাম ধর্মের অবমাননা অতীতেও যেমন হয়েছে তেমনি ভবিষ্যতেও হতে পারে। এখন প্রশ্ন আসতে পারে, একই রকম ধর্মের অবমাননা যদি ভবিষ্যতেও হয়ে থাকে

তাহলে সেই দেশের পণ্য বয়কটই কি উপযুক্ত সমাধান? এই প্রশ্নের আসলে সহজ কোনো উত্তর নেই।

পণ্য বয়কটের মাধ্যমে ধর্মের অবমাননাকারী দেশটিকে কিছুটা চাপে ফেলা যায়, এটা ঠিক। কিন্তু এই দেশটি ফ্রান্স না হয়ে যদি চীন কিংবা আমেরিকা হতো, তাহলে কি মুসলিমরা একইভাবে পণ্য বয়কট করার ডাক দিতে পারত? এটা কিন্তু একটি বড় প্রশ্ন।

বিশ্বের প্রতিটি মুসলিম দেশ চীন এবং আমেরিকার পণ্যের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল। অন্যদিকে পণ্য উৎপাদনের বিচারে ফ্রান্স কিন্তু খুব বেশি জনপ্রিয় দেশ নয়। তাই ফ্রান্সের পণ্য বয়কটের ডাক দেওয়া যতটা সহজ, আমেরিকা কিংবা চীনের পণ্য বয়কটের ডাক দেওয়া এতটা সহজ নয়। আমরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে যে সকল পণ্য ব্যবহার করছি তার বেশির ভাগই আমেরিকা কিংবা চীনে তৈরি। শিল্প কারখানাগুলোতেও বেশিরভাগ কাঁচামাল আসে চীন থেকে। আবার আমরা বিদেশ যেতে যে বিমান ব্যবহার করি, তার অধিকাংশ বিমানই কিন্তু আমেরিকাতে তৈরি। আমাদের অফিসগুলোতে যে কম্পিউটার ব্যবহার হচ্ছে, তার অনেক কম্পিউটারের মূল উৎপাদক আমেরিকান প্রতিষ্ঠান। এই সকল কম্পিউটারে যে সকল সফটওয়্যার ব্যবহার করা হচ্ছে, তার প্রায় সকল সফটওয়্যারের মালিক আমেরিকানরা। তাই পণ্য বয়কটের উল্টো প্রভাবও কিন্তু হতে পারে।

আপনার দেশ অন্য একটি দেশের পণ্য বয়কট করার ডাক দিল। কিন্তু এর প্রতিক্রিয়ায় দেখা গেল সেই দেশটিও প্রতিশোধ নেয়ার জন্য আপনার দেশের পণ্য বয়কট করা শুরু করল। তখন আপনি কী করবেন? বাংলাদেশের মত একটি বৈদেশিক মুদ্রা ও আমদানি নির্ভর রাষ্ট্রের জন্য এই প্রশ্নের উত্তর কিন্তু সহজ নয়।

ইসলাম ধর্মের অবমাননার কারণে বাংলাদেশের নাগরিকরা যদি ইউরোপের কোনো দেশের পণ্য বয়কট করা শুরু করে, এবং এর প্রতিক্রিয়ায় সেই দেশের নাগরিকরাও যদি বাংলাদেশের গার্মেন্টস পণ্য কেনা বন্ধ করে দেয়, তখন আমরা কী করব? আমরা কি তখন এই পণ্য বয়কট চালিয়ে যেতে পারব? মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলির জন্য এই সমস্যাটি অনেক কম। কারণ তারা যে তেল উৎপাদন করে, তার উপর পশ্চিমা বিশ্ব এখনো অনেকাংশে নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতা কিন্তু বেশিদিন থাকবে না।

বর্তমানে তেলের বদলে বিদ্যুৎচালিত গাড়ি খুব দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করছে। ফলে সেইদিন খুব বেশি দূরে নয়, যখন পশ্চিমা বিশ্বে তেলের চাহিদা অনেক কমে আসবে। ফলে মধ্যপ্রাচ্যের উপর পশ্চিমা বিশ্বের দেশগুলির নির্ভরতাও কমে যাবে অনেক। তাই এমন একটি পরিস্থিতিতে ইসলাম ধর্মের অবমাননা হলে মুসলিমদের পণ্য বয়কটের প্রভাব হবে আজকের তুলনায় অনেক কম।

প্রস্তাবিত সমাধান

তাহলে কি আমরা ইসলাম ধর্মের অবমাননায় কোনো প্রকার প্রতিক্রিয়া দেখাব না? কেন দেখাব না। অবশ্যই দেখাব। আমার মনে হয়, ভবিষ্যতে বাংলাদেশের ভিতরে এবং বাইরে যদি একই ধারার ইসলাম ধর্মের অবমাননা হয়, তাহলে আমাদের প্রতিক্রিয়াগুলো হওয়া উচিত সুচিন্তিত এবং বাস্তবধর্মী। হঠাৎ আবেগে ভেসে গিয়ে আমাদের কোনো প্রতিক্রিয়া দেখানো উচিত নয়। এই ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখাতে আমাদেরকে অবশ্যই নিচের বিষয়গুলি মাথায় রাখতে হবে-

১. ধর্মের অবমাননার প্রতিক্রিয়ায় কখনোই আইন নিজের হাতে তুলে নেয়া ঠিক নয়। গুলাগুলি কিংবা বোমা ফাটিয়ে মানুষ হত্যা করা কোনোভাবেই সঠিক প্রতিক্রিয়া হতে পারে না। বাংলাদেশে ধর্মের অবমাননার বিরুদ্ধে কড়া আইন রয়েছে এবং আইনগুলো যথেষ্ট কার্যকর। সম্প্রতি এই ধরনের বেশ কয়েকটি মামলার রায় হয়েছে এবং এই সকল রায়ের মাধ্যমে ধর্মের অবমাননাকারীদের কঠিন শাস্তি হয়েছে। তাই কেউ যদি ধর্মের অবমাননা করে, তার বিরুদ্ধে প্রথম পদক্ষেপ হতে হবে এই বিষয়টি প্রশাসনকে রিপোর্ট করা এবং ধর্মের অবমাননাকারীর বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নেওয়া।

২. ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং সমষ্টিগতভাবে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ একটি যৌক্তিক এবং কার্যকরী প্রতিক্রিয়া হতে পারে। প্রতিবাদের মাধ্যমে বিষয়টির প্রতি সমাজের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং এই কাজটি যে একটি গর্হিত কাজ সে বার্তাটি সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

৩. কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিক এবং মহল যদি এই ধরনের কাজের সাথে যুক্ত থাকে তাহলে সেই দেশের দূতাবাসে গিয়ে রাষ্ট্রদূতের সাথে দেখা করে সুন্দর ভাষায় একটি আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ হস্তান্তর করা একটি উত্তম প্রতিক্রিয়া হতে পারে। এই কাজে যদি স্বনামধন্য কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তিকে যুক্ত করা যায়, তাহলে এই ধরনের প্রতিক্রিয়া বিদেশি মিডিয়াতেও প্রচারিত হবে। ফলে বিশ্বব্যাপী শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের এই উদাহরণ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

৪. কোনো ভিনদেশের নাগরিক বা মহল যদি ইসলামের অবমাননা করে থাকে মনে রাখা উচিত এটি শুধুমাত্র সেই দেশের কিছু নাগরিকের চিন্তার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। সেই দেশের সকল নাগরিক কিন্তু এই কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত নয়। তাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা ধর্মের অবমাননার কর্মকাণ্ড সমর্থন করেন না। তাই বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যদি কোনো নাগরিক থেকে থাকেন, তাহলে তার পরিবারের সদস্যদেরকে এই কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী করা কোনোভাবেই সমীচীন নয়।

৫. মুসলিম হিসাবে আমাদের সকলের বোঝা উচিত ইসলাম ধর্ম নিয়ে অমুসলিমরা যখন এই ধরনের ধর্ম অবমাননার সাথে যুক্ত হয়, তখন এর মূল কারণ থাকে ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের অজ্ঞতা। অমুসলিমরা ইসলাম সম্পর্কে জানে না বলেই এই ধরনের ধর্মীয় অবমাননাকে সঠিক কাজ হিসেবে মনে করে। তাই এই ধরনের ধর্মের অবমাননার সবচেয়ে উৎকৃষ্ট প্রতিক্রিয়া হবে যদি মুসলিমরা তাদের ধর্মের বাণী প্রচারে আরো বেশি উদ্যোগী হয়, অমুসলিমদের কাছে ইসলামের শ্বাশত বাণী সঠিকভাবে পৌছে দেয়। বিশ্বব্যাপী ইসলাম সম্পর্কে যে ভুল ধারণার বিকাশ হয়েছে, তার মূল কারণ কিন্তু ইসলামের সঠিক বাণী বিশ্বব্যাপী প্রচারে মুসলিম সম্প্রদায়ের ব্যর্থতা।

বর্তমানের ইন্টারনেটের যুগে এই ব্যর্থতা কাটানোর সুযোগ অনেক বেশি, এবং মুসলিমদের উচিত দলমত নির্বিশেষে এই সুযোগ পুরোপুরি কাজে লাগানো। ইসলাম ধর্মের অবমাননার প্রবণতাকে চিরতরে থামিয়ে দিতে ইসলাম ধর্মের বাণী প্রচারই সবচেয়ে কার্যকরী অস্ত্র। এর কোনো বিকল্প নেই।

ব্যভিচার ও ধর্ষণঃ সমাধান কোন পথে?

মোস্তফা মনজুর

এদেশে বর্তমান সময়ের এবং সম্ভবত বিগত দুই দশকের সবচেয়ে আলোচিত ও উৎকণ্ঠার ইস্যু হচ্ছে নারীর প্রতি সহিংসতা তথা ব্যভিচার (যিনা), ধর্ষণ, ইভটিজিং, অযাচার, যৌন হয়রানি ইত্যাদি। দিন দিন এ সমস্যা বাড়ছে বৈ কমছে না। আজকাল পত্রিকার পাতা খুললেই চোখে পড়ে এসব অনাকাঙ্ক্ষিত সংবাদ। সোশ্যাল মিডিয়া বলি কিংবা আমাদের সামাজিক-পারিবারিক আড্ডা বলি সবখানেই এই এক আলোচনা। মুসলিম প্রধান দেশ হিসেবে এটা যেমন আমাদের মানবিকতার অবক্ষয়ের জ্বলন্ত উপমা, তেমনই ইসলামী আচার-আচরণ ও মূল্যবোধের সীমাহীন ঘাটতির কথাই প্রচার করছে। হ্যাঁ, আমার বিশ্বাস আমরা বেশিরভাগ জনগণই হয়তো এ পাপ বা গুনাহ থেকে মুক্ত। কিন্তু কতিপয়ের কারণেও যে এই অবস্থা দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছে তার দায়ভার আমরা এড়াতে পারি না। যারা এসব করছে তারা আমাদেরই কারো ভাই, কারো বন্ধু, কিংবা আত্মীয়, নতুবা পরিচিত। সুতরাং সমস্যাটাকে এড়িয়ে না গিয়ে বরং এর গভীরে প্রবেশ করে স্থায়ী ও টেকসই সমাধানই আমাদের কাম্য।

আমরা অবশ্য সমাধান প্রচেষ্টায় একেবারে নিরবও নই। বিবেকবান সব মানুষ, শিক্ষিত-মূর্খ, তরুণ-বৃদ্ধ সবাই নিজ নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে সমাধান প্রদানেও উচ্চকিত। এক্ষেত্রে ডান-বামের বিভেদও খুব একটা দেখা যায় না, সবাই আমরা এসব ঠেকাতে চিন্তিত। সভা- সেমিনার, সেম্পোজিয়াম, গোলটেবিল বৈঠক, উচ্চ পর্যায়ে নীতিনির্ধারণী আলোচনা, গবেষণা ইত্যাদি কী না হচ্ছে? আসলেও তাই হওয়া উচিত। তারপরও ব্যভিচার বা ধর্ষণ কমছে না বরং দিন দিন বাড়ছে। সম্ভবত এমন কোনো দিন নেই যেদিন মিডিয়ার সংবাদে এসবের খবর নেই। এর একটাই কারণ- এসব বন্ধের যত আইন ও পদ্ধতিই গৃহীত হচ্ছে সবই অকার্যকর। কারণ, সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও এর সমাধানে সর্বাত্মক ও যথাযথ গবেষণার অভাব। একমাত্র মাঠপর্যায়ের অনুসন্ধান এবং ইতিহাস ও সামাজিক অবস্থানের বিবেচনা মাথায় নিয়ে যথাসিদ্ধ গবেষণা হয়তো এর সমাধান আনতে পারে। তবে অনেকের নিকট বিস্ময়কর মনে হলেও এটা সত্য যে, প্রায় সাড়ে চৌদ্দশত বছর পূর্বেই ইসলাম এর সমাধান দিয়ে গিয়েছে। ইসলাম এ সমস্যায় যে সমাধানের পথ দেখিয়েছে, তা নিশ্চতরূপেই বাস্তবসম্মত, মানবিক ও কার্যকর।

ক. ব্যভিচার বা ধর্ষণ রোধে আমাদের উচিত সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। এ লক্ষ্যে স্বীকৃত গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করাই উত্তম। তা হচ্ছে- সমস্যা চিহ্নিত করার পর এর সমাধানের জন্য সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে এ সমস্যার কারণ চিহ্নিত করা। তারপর কারণের উপাদান, প্রভাবক, পরিপ্রেক্ষিত, প্রেক্ষাপট সব বিবেচনায় নিয়ে সমাধানের পথ চিন্তা করা। সে হিসেবে ধরে নেওয়া যায়- "সমস্যা > কারণ > প্রেক্ষাপট" সমীকরণে আমাদের উদ্দিষ্ট ফর্মুলা হলো-

- প্রথমতঃ সমস্যা- ধর্ষণ, যৌনাচার ইত্যাদি

- দ্বিতীয়তঃ কারণ- মানসিকতা

- তৃতীয়তঃ প্রেক্ষাপট (উপাদান/প্রভাবক) -অর্থাৎ মানসিকতার কারণ বা পরিপ্রেক্ষিত। মোটাদাগে বলা যায়, নৈতিক-সামাজিক অবক্ষয়, অশ্লীলতার প্রসার, মিডিয়া ও সংস্কৃতিতে পাশ্চাত্য আগ্রাসন, যথাযথ আইন ও এর বাস্তবায়নের অভাব, ধর্মীয় মূল্যবোধের অবক্ষয়, পর্দা প্রথার শিথিলতা ইত্যাদি।

এখানে পাঠকদের দ্বিমত থাকতেই পারে। প্রেক্ষাপটকেও কেউ কোনো ঘটনার কারণ হিসেবে উল্লেখ করতে পারেন কিংবা অনেকে ভাবতে পারেন তৃতীয়টি, অর্থাৎ প্রভাবক নিজেই সরাসরি সমস্যার সাথে জড়িত। তবে সমস্যা যেহেতু মানুষ সম্পর্কিত সেক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ না হোক পরোক্ষভাবে হলেও তাদের মানসিকতা, মানবিক দৈন্যতা এসব কার্যকর থাকবেই। প্রেক্ষাপট বা প্রভাবক হিসেবে আরো অনেক বিষয় আসতে পারে; শুধু কয়েকটি ছাড়া সব কিছু এখানে উল্লেখ করিনি।

সমীকরণের দ্বিতীয় স্তরে মানসিকতাকে উল্লেখ করার কারণ তৃতীয় স্তরের এসব বিষয় সচরাচর মানুষের মানসিকতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে কাজ করে থাকে। এতদসত্ত্বেও এসব উপাদান সব মানুষকে সমানভাবে প্রভাবিত করতে পারে না। মানুষের পরিচালক হচ্ছে নফস। নফসের যথাযথ পরিভাষা বাংলায় নেই। অন্তর, হৃদয়, প্রবৃত্তি এসব নানা অর্থেই এটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উপস্থাপকের বা বক্তার উদ্দেশ্য অনুপাতে এসব অর্থ প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। তবে অর্থ যা-ই হোক, নফসই মূলত মানুষের মানসিকতার নিয়ন্ত্রণের মূল চাবিকাঠি।

খ. আমরা জানি, মানুষের নফস (প্রবৃত্তি) তিন ধরনের- নফসে আম্মারাহ, নফসে লাওওয়ামাহ ও নফসে মুত্বমায়িন্নাহ। (অনেকে এগুলোকে নফসের প্রকার না বলে, নফসের তিন ধরনের অবস্থা হিসেবে বর্ণনা করেছেন)

মানুষের মধ্যে যখন নফসে আম্মারাহ (কু-প্রবৃত্তি) প্রভাব বিস্তার করে তখন সে পশুত্বের পর্যায়ে চলে যায়। শয়তানের প্ররোচনা বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে নফসে আম্মারাহ প্রবল হয়ে উঠলে মানুষ খারাপ কাজকেই প্রাধান্য দেওয়া শুরু করে। পবিত্র কুরআনে সরাসরি এ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, "নিশ্চয় নাফস মন্দ কজের নির্দেশ দিয়ে থাকে" (সূরা ইউসুফ, আয়াত ৫৩)। দ্বিতীয় প্রকারের নফস হলো নফসে লাওওয়ামাহ বা তিরস্কারকারী নফস। এ নফস নিজের খারাপ কাজের জন্য নিজেকে তিরস্কার করে ও পাপ হতে বিরত থাকতে প্রেরণা দেয়। অনেকে নফসের এ অবস্থাকে 'বিবেক' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। পবিত্র কুরআনে এসেছে, "আমি শপথ করি কিয়ামত দিবসের এবং আরও শপথ করি সেই মনের, যে নিজেকে ধিক্কার দেয়" (সূরা কিয়ামাহ, আয়াত ১-২)। তৃতীয় প্রকারের নফস হলো নফসে মুত্বমায়িন্নাহ বা প্রশান্ত হৃদয়। এটি হচ্ছে প্রতিশুদ্ধ অন্তর, যে অন্তর খারাপ কাজ ও প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে মুক্ত। আল্লাহ তাআলা এরূপ অন্তরকেই উদ্দেশ্য করে বলেছেন, "হে প্রশান্ত মন, তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট ফিরে যাও সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। অতঃপর আমার (বিশিষ্ট) বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং

আমার জান্নাতে প্রবেশ কর" (সূরা ফাজর, আয়াত ২৭-৩০)।

ব্যক্তি মানুষের নফস বা প্রবৃত্তির ন্যায় একই সমাজ ও পরিবেশে বাস করেও আমরা নারীর প্রতি যৌনাচারের ক্ষেত্রে সাধারণত তিন শ্রেণির মানুষ দেখতে পাই-

ক. সৎ মানসিকতাসম্পন্ন; পরিবেশের উপাদানসমূহ যাকে খারাপ করতে পারেনি।

খ. দুর্বল মানসিকতাসম্পন্ন; এ প্রকৃতির মানুষ সাধারণত সুযোগ সন্ধানী। সুযোগ পেলে খারাপ কাজ করতে পারে, আবার অনুশোচনাও করে।

গ. খারাপ মানসিকতাসম্পন্ন; এরা নিজেরাই সুযোগ সৃষ্টি করে নেয়।

এ তিন শ্রেণির মানুষের প্রতিটি শ্রেণিতে আবার মাত্রাগত তারতম্যও বিদ্যমান। যেমন সৎ মানসিকতাও সবার একরকম নয়। কেউ হয়তো জীবনের বিনিময়েও এসব খারাপ কাজে প্রবৃত্ত হবে না। কেউ হয়তো অবস্থার স্বীকার হয়ে শয়তানের প্ররোচনায় খারাপ কাজে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে। এটা অনেকটা তাকওয়ার স্তর বিন্যাসের মতো। [তাকওয়ার বিভিন্ন স্তর রয়েছে। যেমন- কুফর ও শিরক থেকে বেঁচে থাকা, হারাম থেকে বেঁচে থাকা, মাকরূহ থেকে বেঁচে থাকা, যেসব কাজ আখিরাতের জন্য উপকারী নয় সেসব মুবাহ ও জায়িয কাজ থেকেও বেঁচে থাকা, যেসব কাজ আল্লাহকে পাওয়ার জন্য কাজে লাগে না তা থেকেও বেঁচে থাকা ইত্যাদি।]

এখন সমাজকে সার্বিক বিচারে যৌনাচারের অন্ধকার থেকে মুক্ত করতে হলে প্রয়োজন বিভিন্ন পর্যায়ের উদ্যোগ। অর্থাৎ শুধু খারাপ মানসিকতা সম্পন্ন লোকদের ভালো করার উদ্যোগ নেওয়া হলো, বাকী দুই শ্রেণিকে নিরাপদ মনে করা হলো। তাতে সমস্যা কমবে না। কারণ প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণির লোক এসব করবে না, এটা সুনিশ্চিত নয়। মানুষ ফেরেশতা নয়, প্রবৃত্তি ও শয়তান সর্বদাই মানুষের পেছনে লেগে আছে। সুতরাং প্রয়োজন সবাইকে সমভাবে গুরুত্ব দিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

তৃতীয় শ্রেণির মানুষকে হয়তো আইন দিয়ে আটকে রাখা যায়। অর্থাৎ শাস্তিমূলক আইন প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন। আবার দ্বিতীয় শ্রেণিকে মোটিভেশন কিংবা পরিবেশের সুস্থতার দ্বারা প্রথম পর্যায়ে উন্নীত করা যায়। অর্থাৎ খারাপ কাজের পথ বন্ধ করে দিয়ে তাদেরকে এ সমস্যা থেকে মুক্ত রাখা যায়। প্রথম পর্যায়ের লোকদের এসব বিরোধী ক্যাম্পেইনে সরাসরি সম্পৃক্ত করেও তাদের সৎ গুণাবলি অটুট রাখার ব্যবস্থা করা যায়।

গ. আরো একটি বিষয় লক্ষণীয়, শুধু তিন শ্রেণির মানুষের উপর কাজ করাই যথেষ্ট নয়। বরং সমস্যাকে সার্বিক বিচারে পর্যবেক্ষণ করা উচিত। এমন নয় যে শুধু প্রভাবক বা উপাদানগুলো নিয়েই কাজ করলাম কিন্তু এর পেছনের মানসিকতাকে স্বাধীন ছেড়ে দিলাম। এতে তৃতীয় শ্রেণির মানুষের অবাধ যৌনাচারের সুযোগ থেকেই যায়। কেননা তারা এবং প্রথম শ্রেণিও মানসিকভাবে তুলনামূলক শক্ত অবস্থানে যা পরিবর্তন করা বেশ দুঃসাধ্য।

আবার এমনও হওয়া উচিত নয় যে, কঠোর আইন করে এর প্রয়োগ নিশ্চিত করলাম কিন্তু মনোজাগতিক পরিবর্তনের চেষ্টা করলাম না। এতেও সার্বিক বিচারে কাজ হবে না। কারণ এতে তৃতীয় শ্রেণির মানুষ দ্বিতীয় শ্রেণির মুখোশ পরে নেবে। পাশাপাশি সমাজের নানা প্রভাবকের সুযোগ নিয়ে যৌনাচারের মানসিকতা প্রকাশ করবে। এজন্য হুট করে কোনো একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে, রাতারাতি এ সমস্যার সমাধান আশা করা দুরাশা বৈ কিছুই নয়। এ লক্ষ্যে প্রথমেই প্রয়োজন সার্বিক ও সর্বাত্মক প্রচেষ্টা (holistic approach)।

ঘ. আমাদের চিন্তার চাইতেও বেশ বড় একটা অংশের ধারণা হলো- এ ইস্যুতে আমাদের সমাজকে পুরোপুরি পাশ্চাত্য সমাজের আদলে ঢেলে সাজালে হয়তো সমাধান সম্ভব। অর্থাৎ ফ্রি মিক্সিং; অবাধ যৌনাচারের স্বাধীনতা, যেখানে সম্মতিই চূড়ান্ত। সমাজের সবপর্যায়ে, শিশু থেকে বৃদ্ধ, গ্রাম থেকে শহর, অবাধ স্বাধীনতা দিয়ে রাখলে এ বিষয়টা হয়তো এতটা খারাপ পর্যায়ে যাবে না। কেননা এতে সকলেই অভ্যস্ত হয়ে যাবে। নারীসঙ্গ লাভের উগ্র বাসনা খুব একটা কাজ করবে না ফলে যৌনাচারের ভয়াবহতা কমে আসবে। আবার পাশ্চাত্যের ন্যায় পরস্পরের সম্মতিক্রমে যৌনাচার হলে তাতে অভিযোগ বা হয়রানির পথও বন্ধ হয়ে যাবে।

তাদের এ চিন্তা যদি এ সমস্যা সমাধানের জন্য হয় তাহলে অন্তত সমাধান চিন্তার জন্য তাদের ধন্যবাদ দেওয়াই যায়। তবে এটা অনেকটা পাগলদের মাঝে পাগল সেজে থাকার মতোই। সমস্যা হলো, পাগলের ভানকারী যে কোনো সময় তার আসল রূপে ফিরে যেতে পারে। যাই হোক, বহুবিধ কারণে এদেশে এমনকি সম্ভবত বিশ্বের সবখানেই এ পন্থা কার্যকর নয়। কারণ এ চিন্তা বাস্তবসম্মত নয়। ফ্রি মিক্সিং হলেই যে সবাই আকর্ষণ হারিয়ে ফেলবে তা কিন্তু নয়। বরং সম্মতি না পেলে এর চাইতেও বেশি খারাপ অবস্থা হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে।

-এ ধারণায় প্রথম শ্রেণির মানুষকে অস্বীকার করা হচ্ছে। অথচ সমাজের এই শ্রেণির মানুষের কারণে ফ্রি মিক্সিং সার্বজনীনতা পাবে না। গ্রহণীয় ও শালীনতার একটা মাপকাঠি সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করবেই।

-এতে পাশ্চাত্যের আদলে আইন ও এর প্রয়োগকে খুব গুরুত্বের সাথে দেখা হয়। কিন্তু তাতে দ্বিতীয় প্রকার মানুষের অবস্থান পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না। এজন্যই দেখা যায়, পাশ্চাত্যে লোডশেডিং হলে হাজার নারী ধর্ষিত হয়; কেননা সুযোগ সন্ধানীদের তখন আইন আর আটকাতে পারে না। কুমারী মায়েদের দুর্দশার কথা নাইবা বললাম। পাঠক একটু কষ্ট করলেই ইন্টারনেটে পাশ্চাত্যে ধর্ষণের পরিমাণ ও কুমারী মায়েদের অবস্থা সম্পর্কে ভূরিভূরি প্রমাণ পেয়ে যাবেন। উল্লেখ্য যে, এখনো মুসলিম দেশসমূহে ধর্ষণ ও নারী সহিংসতার হার অনেক অনেক কম। টুটাফাটা হলেও তা ইসলামী মূল্যবোধ আর ইসলাম অনুশীলনের ফল।

-সমাজের অন্যান্য প্রভাবকের (অশ্লীলতা, মিডিয়ার আগ্রাসন) ফলে মানুষের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণির মানুষের আধিক্য দেখা দেয়। এমনকি প্রথম শ্রেণির মানুষও দ্বিতীয় শ্রেণিতে নেমে আসতে পারে।

সর্বোপরি, পাশ্চাত্যের আদলে করতে চাইলেও মনে রাখা উচিত খোদ পাশ্চাত্যই এ সমস্যা থেকে মুক্ত নয়। যেখানে নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ দুর্বল, ধর্ম নখদন্তহীন, সে সমাজে শুধু মানসিকতাকে অবাধ স্বাধীনতা দিয়ে এবং আইন করে ধর্ষণ রোধ করা যায় না। উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর প্রতি তাকালে এ দৃশ্যই চোখে পড়ে। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ধর্ষণের তালিকায় আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, সুইডেন, অস্ট্রেলিয়া যেমন আছে তেমনই আছে ভারতও। অথচ বেশ ক'বছর আগেও এ তালিকায় ভারত ছিল না। কারণ সেখানে ধর্মের প্রভাব কিছুটা হলেও ছিল। মিডিয়ার অনাচার তা সফলতার সাথে দূর করে ভারতকে সেরা দশে ঠাঁই করে দিয়েছে।

এ ধারণার (ফ্রি মিক্সিং) আরো বড় একটা অসুবিধা হলো এতে আইনের সহজাত উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। আইনের মূল উদ্দেশ্য হলো জীবনকে সহজ করা। এক্ষেত্রে জীবন বলতে ব্যক্তি জীবন নয়; সামষ্টিক, সামাজিক। উদাহরণস্বরূপ, আইন না থাকলে কি হয় তা একবার ট্রাফিক আইন তুলে দিলেই বুঝা যাবে। জীবন কত কঠিন। ইসলামেও যেমন বলা আছে, কিসাস (হত্যার বিনিময়ে হত্যা) এর মধ্যে জীবন রয়েছে; তা হত্যাকারীর জীবন নয়, সমাজের বাকী জনগণের। অর্থাৎ হত্যাকারীকে হত্যা করা হলে বাকি জনগণ এ থেকে শিক্ষা নেবে এবং অপরকে হত্যা হতে বিরত থাকবে।

যাই হোক, অবাধ স্বাধীনতা দিয়ে কঠোর আইন করলে তা অনেকটা ক্ষুধার্ত বাঘকে খাবার দেখিয়ে না দেওয়ার মতো হয়ে যায়। পাশ্চাত্যে sexual harassment কিংবা child abuse ইত্যাদি ক্ষেত্রে আইন খুব কঠিন। বিনা সম্মতিতে কিছু করলেই sexual harassment; পরিণতিতে-চাকরি, পেনশন-সম্মান সব শেষ।

এখন মানুষকে নানা প্রভাবক (খোলামেলা চলাফেরা, পর্ন সাইটের সহজলভ্যতা, মিডিয়ায় অশ্লীলতার সয়লাব) যখন সারাদিন উত্তেজিত করবে আর আইন তা ঠেকিয়ে রাখবে; তখন তা জীবনকে সহজ করে না বরং কঠিনই করে। যার ফলাফল সুযোগ পেলেই ঝাপিয়ে পড়া। তা হতে পারে নিজ দেশে, হতে পারে বিদেশে যুদ্ধক্ষেত্রের বন্দীদের নিয়ে। নিদেনপক্ষে তালাকের মাধ্যমে।

বাংলাদেশেও এমনই হচ্ছে। প্রভাবকের নিয়ন্ত্রণ না করে নারী বান্ধব আইন করে পুরুষরা যেমন নির্যাতিত হচ্ছে। তেমনই সুযোগের অবাধ ব্যবহারও ধর্ষণ আর নারী নির্যাতনের হার বাড়িয়েই তুলেছে। সুতরাং, এককেন্দ্রিক চিন্তা কোনো সমাধান বয়ে আনতে পারছে না; কোনো দেশেই না, কোনো সময়েও না।

ঙ. এবার আসি এ প্রসঙ্গে ইসলামের বক্তব্য নিয়ে। নির্দ্বিধায় বলা যায়, ইসলামই একমাত্র এ সমস্যায় সর্বাত্মক সমাধান প্রদান করেছে। ইসলাম শুধু মানসিকতার পরিবর্তনে হাত দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, দিয়েছে প্রভাবক আর উপাদানের ব্যাপারেও নির্দেশনা। পাশাপাশি শুধু নারীদের নয়, পুরুষদের দায়িত্ব কর্তব্যও নির্ধারিত করেছে, তিন শ্রেণির প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা কর্মপদ্ধতি বর্ণনা করেছে। ইসলামী আইনে মানসিকতার পরিবর্তনে শুধু মন-মানসের উপরই অনুপ্রেরণা আর উৎসাহ চাপিয়ে দেয়নি; বরং মানসিকতা পরিবর্তনের প্রভাবক উপাদানগুলোর ব্যাপারেও সীমাবদ্ধতা আরোপ করেছে। ইসলামে আইন প্রয়োগ ও শাস্তি প্রদান অনেকটা প্রতিষেধকের মতো। তার আগে রয়েছে প্রতিরোধ প্রচেষ্টা। এতে শাস্তি দেওয়ার চাইতে পাপ না করার প্রতিই বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়। ইসলামের এ প্রক্রিয়া অনেকটা এমন- সমাধান=প্রতিরোধ [মোটিভেশন (ভয়-আশা), মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা, প্রভাবকের নিয়ন্ত্রণ, পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ] + প্রতিষেধক (ব্যক্তিগত, সামাজিক)।

'ব্যভিচার প্রতিরোধে করণীয়' দেখুন আগামী সংখ্যায়

আচার-আচরণ ও মানবিক মূল্যবোধ

আফতাব চৌধুরী

মূল্যবোধের অভাবে সমাজ ও দেশ আজ হাজারো সমস্যায় জর্জরিত। দেশের মানুষ দিগ্বিদিক ছুটছে এতটুকু শান্তির আশায়। হিংসা বিদ্বেষ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। এ অঞ্চলের আকাশে শান্তির শ্বেত কপোত এখন আর ডানা মেলে উড়ছে না। কেন মানুষ আজ দুর্বিষহ জীবন যাপন করছে? কেন এ দেশের অভিধান থেকে শান্তি শব্দটি মুছে যাবার উপক্রম হয়েছে? আমরা যদি এর কারণটা বিশ্লেষণ করতে যাই তাহলে দেখা যাবে মূলত আদর্শের অভাব। সমাজ বা রাষ্ট্রীয় জীবনে আদর্শের অনুপস্থিতি। এটা অবশ্যই বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্যে চাই আদর্শ মানুষ। যুগে যুগে পৃথিবীতে আনন্দ, শান্তি ও সাম্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন আদর্শবাদীরাই। মুসলমান হিসেবে আমাদের কাছে আদর্শের শ্রেষ্ঠতম দৃষ্টান্ত হচ্ছেন মহান আল্লাহর প্রিয়তম হাবীব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)। তাঁর জীবনী পাঠ করলেই আমরা সত্যিকার আদর্শ কী, আদর্শ কাকে বলে, তা অনুধাবন করতে পারি। আদর্শ হচ্ছে এমন এক প্রহরী যা মানুষকে সৎপথে চলতে শেখায়। ঐক্য, বিশ্বাস, ধৈর্য্য ও সহনশীলতা আদর্শ ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য। আদর্শবান লোকেরাই একটি আদর্শ সমাজ গড়ে তুলতে পারে। মানুষ জীবনকে সুখময়, শান্তিময় করার জন্য, তাদের জীবন চলার পথকে সুগম করার জন্য আদর্শ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে চায়। কারণ আদর্শ ব্যক্তির জীবনে অনেক গুণের সমাহার থাকে। তার জীবনের সার্বিক কর্মকাণ্ডে থাকে সততার স্বাক্ষর। একজন আদর্শবান ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ গুণ হলো শিষ্টাচার। শিষ্টাচার বা সৌজন্যবোধ হলো মানব চরিত্রের অলংকার। যেসব গুণাবলি মানব চরিত্রকে সুন্দর আকর্ষণীয় ও গৌরবান্বিত করে তুলে তন্মধ্যে শিষ্টাচার হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের কার্যকলাপে, কথাবার্তায়, আচার- আচরণে যখন ভদ্রতা প্রকাশ পায় তখন তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় শিষ্টাচারের নিদর্শন। জীবন চলার পথে প্রতিটি মানুষ কথাবার্তায়, ভাব বিনিময়ে, লেনদেনে একে অপরের মুখোমুখি হয়। নানাভাবে সম্পৃক্ত থাকে তার সংসার, সমাজ জীবন বা রাষ্ট্রীয় জীবনে। তাই জীবন চলার পথে সৌজন্যবোধের গুরুত্ব অপরিসীম। সুন্দর ব্যবহার দিয়ে মানুষের হৃদয় জয় করা যায়। শিষ্টাচার বর্তমান থাকলে সকল প্রকার সম্পর্কের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় থাকে। সম্প্রীতি না থাকলে বিষাক্ত হয়ে উঠে জীবন। সর্বত্র দেখা দেয় অশান্তি। জীবন থেকে সুখ পালিয়ে যায়। সমাজ জীবনকে বিশৃঙ্খলার দিকে ঠেলে দেয়। ফলে সমাজে সৃষ্টি হয় প্রবল অশান্তি। শিষ্টাচারের অভাব সমাজের জন্যে ক্ষতিকর। চমৎকার আচার আচরণে, বিনম্র ব্যবহারে, সৌজন্যবোধে, ভদ্রতায় উত্তম মানুষের প্রকৃত পরিচয় নিহিত। শিষ্টাচার সামাজিক পরিবেশকে করে শান্তিময়, জীবনকে করে সুন্দর। জাতীয় জীবনে সুনাম ও সমৃদ্ধি আনয়ন করে। তাই ব্যবহার মার্জিত এবং শোভন হওয়া উচিৎ।

মানুষের সাথে ব্যবহার সম্পর্কে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) আমাদের যে শিক্ষা দিয়েছেন তার আলোকে বলা যায়, 'ভালো ব্যবহারের বিনিময়ে ভালো ব্যবহার এটার নাম ভালো ব্যবহার নয়। মন্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভালো ব্যবহার এটাই ভালো ব্যবহার।' শত্রুর সঙ্গে সবসময় ভালো ব্যবহার করলে সে একদিন বন্ধুতে পরিণত হবে। মৃত্যুর পরে যে কারণে মানুষ সাধারণ মানুষের হৃদয়ে অম্লান হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে তার ব্যবহার। সুন্দর নির্মল ব্যবহার মৃত্যুর পরেও মানুষকে স্মৃতিতে অম্লান করে রাখে। অন্যের ব্যবহারে নিজে বিরক্ত হয়ে থাকলে ধরে নিতে হবে নিজের ব্যবহারেও অন্যরা আঘাত পায়। অশোভন, অমার্জিত, অশালীন ব্যবহারে আমরা ক্রোধ প্রদর্শন করি। ভুলেও সেরকম ব্যবহার করতে নেই। নির্দয় ব্যবহার সহনশীল লোকেরও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটায়। অনেক সময় অন্যায় ব্যবহারকে বিভিন্ন কারণে সহ্য করে নিতে হয়। এতে অনেক সময় কারো ক্ষতি হয়ে যায়। ভালো ব্যবহার করতে গেলে ছোট ছোট স্বার্থ ত্যাগ করতেই হয়। ধনী এবং গরীবের সাথে আমরা কিভাবে ব্যবহার করব তার একটি ইংগিত দিয়েছেন আমাদের বড়পীর হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (র.)। তিনি বলেছেন, ধনীর সঙ্গে আত্মমর্যাদা বজায় রেখে কথা বলবে এবং দরিদ্রের সাথে আত্মমর্যাদা ভুলে কথা বলবে। তোমার স্বাভাবিক ব্যবহার ও বিনয় অকৃত্রিম হতে হবে। আল্লাহর প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) বলেছেন, আল্লাহর সৃষ্ট জীবের সাথে সৎ ব্যবহার করলে যে পরিমাণ খোদার সন্তুষ্টি লাভ করা যায় তা আর কোনো পন্থায় সম্ভব হয় না।

সংসার জীবন পালন করতে গিয়ে অনেক সময় পরিবারের সদস্যদের একে অপরের সাথে ভুল বোঝাবুঝি হয়। শ্রদ্ধাভাজন ও স্নেহভাজনের ব্যবধান ভুলে রাগের মাথায় অনেকেই অমার্জিত, অশালীন ব্যবহার করতে কার্পণ্য করে না। মানুষের সাথে ব্যবহার সম্পর্কে সাবধানবাণী উচ্চারণ করে ডা. লুৎফর রহমান বলেছেন, মানুষের সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহার করে যে খোদার সঙ্গে প্রেম করতে চায় তার বুদ্ধি কম। হযরত ওমর (রা.) বলেছেন, মানুষের পরিচয় ব্যবহারে, মানুষ আত্মীয় হয়ে উঠে ঘনিষ্ঠতায়। আমরা অনেক গুণে গুণান্বিত হলেও আমাদের অনেকের মধ্যে ব্যবহারে সৌন্দর্য নেই। আমাদের শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যারা বিনয়ী, ভদ্র ও অমায়িক তারাই আমার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়। তাই সমাজ তথা দেশের সার্বিক কল্যাণের জন্যে অহংকার এবং হিংসা পরিত্যাগ করে স্বীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে আমাদেরকে আরও মনোযোগী হতে হবে। অন্যের সাথে উত্তম ব্যবহারে সমাজে আসবে শান্তি, আসবে সফলতা।

থার্টি ফার্স্ট নাইট উদযাপন বিজাতীয় সংস্কৃতি

মুহাম্মদ মাহমুদুল হাসান

বাংলাদেশে থার্টি ফার্স্ট নাইটের মাধ্যমে ইংরেজি নববর্ষ উদযাপন এবং পহেলা বৈশাখে বাংলা নববর্ষ পালনের রীতি দেখা যায়। খ্রিষ্টপূর্ব ৪৬ সালে জুলিয়াস সিজার সর্বপ্রথম নববর্ষ উৎসবের প্রচলন করে। এরপর থেকে বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন তারিখ অনুযায়ী নববর্ষ পালিত হয়ে আসছে।

ইতিহাস অনুসন্ধান করলে পাওয়া যায়, নববর্ষ পালন প্রথার সাথে মুসলমানদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। তাছাড়া বর্তমান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী পয়লা জানুয়ারি ইংরেজি নববর্ষ পালন করা বা থার্টি ফার্স্ট নাইটের মাধ্যমে গ্রেগরীয় বর্ষপঞ্জির প্রথম তারিখ উদযাপন করা খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের জাতিগত সংস্কৃতি। প্রমাণস্বরূপ, বাংলাদেশে সরকারিভাবে ০১ জানুয়ারিকে খ্রিষ্টান পর্বের ঐচ্ছিক ছুটি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। যেহেতু এই উৎসব এবং সংস্কৃতি খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের ধর্মীয় এবং জাতিগত পরিচয় বহন করে সে জন্য ইংরেজি নববর্ষ পালন করা ইসলামী শরীআত অনুমোদন করে না। ইসলামী শরীআতের প্রসিদ্ধ মূলনীতি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ "যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য গ্রহণ করবে, সে তাদের দলভুক্ত হবে অর্থাৎ তার হাশর-নশর তাদের সাথে হবে।" (আবূ দাউদ)

একজন মুসলমানকে বিধর্মীদের যে কোনো উৎসব থেকে নিজেকে দূরে রাখা কর্তব্য। এ সকল উৎসব-অনুষ্ঠান পালন করা তো দূরের কথা বরং এগুলোতে উপস্থিত হওয়াও নিষেধ। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراماً

"আর যারা মিথ্যা কাজে যোগদান করে না এবং যখন অসার ক্রিয়াকর্মেও সম্মুখীন হয়, তখন মান রক্ষার্থে ভদ্রভাবে চলে যায়।" (সূরা ফুরকান, আয়াত ৭২)

এই আয়াতের (الزور) শব্দের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনু সীরীন, দাহহাক, ইকরামাহ মুজাহিদসহ প্রমুখ মুফাসসির বলেন, এখানে মিথ্যা কাজ বলতে বিধর্মীদের উৎসবের কথা বলা হয়েছে। যাতে মুসলমানদের উপস্থিত হওয়া জায়িয নেই। ইমাম বায়হাকী (র.) হযরত উমর (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তোমরা আল্লাহর দুশমনদের উৎসব থেকে বিরত থাকো।

এ থেকে বুঝা যায় মুসলমানদের জন্য বিধর্মীদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করাও অন্যায়, গর্হিত কাজ। যেখানে তাদের উৎসবে উপস্থিত হওয়াও অপরাধ সেখানে ইংরেজি নববর্ষের নামে খ্রিষ্টীয় উৎসব পালন করা কত জঘণ্য হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরত করার পর দেখলেন মদীনাবাসী দুটি দিনকে খেলাধুলা এবং উৎসবের মাধমে উদযাপন করছে। এ সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞেস করলে তারা বললেন, জাহেলী যুগে আমরা এ দুই দিনে উৎসব পালন করতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বললেন, এ দুই দিনের পরিবর্তে আল্লাহ তাআলা তোমাদের উত্তম দুটি দিন দিয়েছেন: ঈদুল আদ্বহা এবং ঈদুল ফিতর। (আবূ দাউদ)

এখানে একটি কথা লক্ষণীয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাবাসীদেরকে আনন্দ-উৎসব পালন করতে নিষেধ করেননি বরং বিজাতীয় সংস্কৃতি বাদ দিয়ে নিজস্ব উৎসব এবং সংস্কৃতি পালনের কথা বলেছেন। এই নিষেধের পেছনে কারণও আছে। যেমন, প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীদের জন্য নির্দিষ্ট কিছু বিধান এবং স্বতন্ত্র কিছু নিয়ম-কানুন নির্ধারিত থাকে। যার মাধ্যমে তাদের ধর্মীয় স্বকীয়তা ও জাতিগত পরিচয় ফুটে উঠে।

উৎসব-সংস্কৃতি সংক্রান্ত শরঈ নীতিমালা এবং ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় নববর্ষ উদযাপন করা ইসলামী সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত নয়। এমন সংস্কৃতি ও উৎসব পালন করার অর্থ হলো কোনো অনৈসলামিক কাজকে গ্রহণ করা। যার ফলাফল দাঁড়ায় কুফরী নতুবা কবীরাহ গুনাহ। উপরন্তু আমাদের দেশে থার্টি ফার্স্ট নাইটের পার্টিতে মদ্যপানের আসর, বেহায়াপনা ও নির্লজ্জতার আয়োজন করা হয়। তা যে নৈতিক অধঃপতনকে ডেকে আনে তা একজন সুস্থ মস্তিষ্কের লোক অস্বীকার করার সুযোগ নেই। পহেলা বৈশাখ বা বাংলা নববর্ষ উদযাপনে মঙ্গল প্রদ্বীপ জ্বালানো, হনুমান, পেঁচা সহ বিভিন্ন প্রাণির মুখোশ নিয়ে আনন্দ শোভাযাত্রা করা হিন্দু ধর্মকেই উপস্থাপন করে। একজন মুসলমানের জন্য এগুলো সমর্থন করা, এতে উপস্থিত হওয়া বা পালন করা হারাম-নিষিদ্ধ। মোটকথা, নববর্ষ পালন করার সংস্কৃতি কখনো মুসলমানদের ছিল না, তাই এগুলো থেকে বিরত থাকা মুসলমানদের জন্য আবশ্যক।

মুমিনের নববর্ষ

নতুন বছরের শুরুতে একজন প্রকৃত মুমিনের চিন্তা-ভাবনা উৎসব-আমেজের নয় বরং চিন্তা এবং ভয়ের। বিগত বছরের যাবতীয় কার্যাবলি সম্পর্কে মহান মালিকের ভয়ে কম্পিত থাকার। একটি বছরের সীমানায় দাঁড়িয়ে মুমিনের ভাবনা হলো, আমার জীবন থেকে আরো একটি বছর চলে গেল, আমি মৃত্যুর দিকে আরো একটি বছর এগিয়ে আসলাম। নতুন বছরে যদি আমি মারা যাই তাহলে মহান আল্লাহর দরবারে আমি কী পেশ করব? এই চিন্তা-ভাবনা যে মুমিনের অন্তরে থাকবে সে কখনো নতুন বছরের আগমনে আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠতে পারে না। হযরত উমর রা. বলেন,

حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا

"তোমাদের কাছ থেকে হিসাব-নিকাশ গ্রহণের আগেই নিজেরা নিজেদের হিসাব করে নাও"। এ জন্য একজন মুমিন নববর্ষে নয় বরং প্রত্যেক দিনের শেষেই নিজের জীবনের হালখাতা উন্মোচন করে হিসাব-নিকাশ করবে। পরের দিনের শুরুতে মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবে, আল্লাহর কাছে দিনের কল্যাণ কামনা করবে। মুমিন জীবনে শরঈ মানদণ্ডের বাহিরে এসে আলাদা কোনো দিনের মহত্ত্ব নেই। এ জন্য বলা হয়, মুমিনের প্রতিটি দিনই নববর্ষ। ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর দাদা স্বীয় সন্তান ছাবিতকে নিয়ে পারস্যের নববর্ষের দিন (নওরোয) হযরত আলী (রা.) এর কাছে গেলেন এবং কিছু হাদিয়া পেশ করলেন। (হাদিয়াটি সম্ভবত নববর্ষ উপলক্ষে ছিল) হযরত আলী (রা.) বললেন, মুমিনের প্রতিটি দিনই তো নববর্ষ। (আখবারু আবি হানীফাহ)

মনীষী

ইমাম গাযালী: ইসলামের প্রতিরক্ষা দেয়াল

মো. ফরিদ উদ্দীন

হিজরী ৫ম শতকে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা উন্নত শিখরে পৌঁছেছিল। ইসলামের বিশ্বময় বিকাশের যুগে ইমাম গাযালী আভির্ভূত হন। তখন ইহুদী, খ্রিষ্টান ও নাস্তিকসহ ইসলাম বিদ্বেষী পণ্ডিত ও দার্শনিকগণ তাহাদ্দিয়াতে ইলমীতে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ ছুড়তে থাকে। এমনকি মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরে বিভিন্ন গোমরাহ ফিরকার জন্ম হয়। যিনি এসব ফিতনার হাত থেকে দ্বীন ইসলামকে রক্ষা করেন তিনি হলেন ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল গাযালী। এ কারণেই তাঁকে ইসলামের প্রামাণ্য দলীল বা হুজ্জাতুল ইসলাম বলা হয়। তিনি 'ইসলামের প্রতিরক্ষা দেয়াল' অভিধায় পরিচিত।

তাঁর নাম আবু হামিদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল গাযালী। হিজরী ৪৫০ মোতাবেক ১০৫৮ খ্রি. পারস্য বা বর্তমান ইরানের তূস নগরের এক ব্যবসায়ী পরিবারে তাঁর জন্ম হয়।

তূস নগরে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। অল্পদিনের মধ্যেই পবিত্র কুরআন মুখস্থ করে নেন। মক্তবের শিক্ষা শেষে তিনি মহামনীষী উস্তাদ আবু হামিদ আসফারায়েনী ও উস্তাদ আবু মুহাম্মদ যুবেনীর নিকট আরবী ও অন্যান্য বিষয় অধ্যয়ন করেন। উস্তাদ ফকীহ আহমদ বিন মুহাম্মদ রাযকানীর নিকট ফিকহ শাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করেন। খোরাসান রাজ্যের নিশাপুরে প্রতিষ্ঠিত প্রথম আরবী বিশ্ববিদ্যালয় তথা নিজামিয়া মাদরাসার 'ইমামুল হারামাইন' খ্যাত আল্লামা আবুল মাআলী আল জুআয়নীর নিকট উচ্চতর শিক্ষালাভ করেন। মাত্র বিশ বছর বয়সে তিনি আকাইদ ও ফিকহের সূক্ষ্ম বিষয়াদি সম্পর্কে গবেষণা করতে শুরু করেন। উস্তাদের ওফাতের পর নিশাপুর ত্যাগ করে তিনি সেলজুক ওয়াদীর নিজামুল মুলকের দরবারে আইনজ্ঞ আলিম বা মুফতী হিসেবে অমাত্য পদ গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি বাগদাদের নিজামিয়া মাদরাসায় অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। এই সময় তিনি ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনশাস্ত্রে ব্যাপক গবেষণা শুরু করেন এবং পুস্তক প্রণয়নে ব্যস্ত থাকতেন। তখন তালিমী সম্প্রদায় নামে একটি ভণ্ড ও পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের উদ্ভব হলে তিনি তাদের বিরুদ্ধে কয়েকটি পুস্তক রচনা করেন।

হিজরী ৪৮৮ সালের জিলকদ মাসে তিনি পার্থিব উচ্চাকাঙ্ক্ষা, পদমর্যাদা পরিত্যাগ করে বাগদাদ হতে বেরিয়ে পড়েন। দরবেশের জীবন গ্রহণ করে প্রয়োগবাদীর ভূমিকায় অধিষ্ঠিত হন। প্রচার করতে লাগলেন যে, বুদ্ধিবৃত্তির উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন বিভ্রান্তির কারণ। জ্ঞানের মধ্যে কেবল দর্শনাশ্রয়ী কোনো ভিত্তি নেই। তিনি বলেন, চিন্তাশ্রয়ী অস্তিত্ববিদগণের পদ্ধতির মাঝেও কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক নিশ্চয়তা নেই। কবি ও তাদের মতবাদের সত্যতাও নিশ্চিত নয়। কোন দার্শনিক মতবাদ গগনপ্রসারী যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করা যায় না। আল্লাহ পাক যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান দ্বারা মুমিনদের অন্তরকে প্লাবিত করেন কেবল সেই জ্ঞান দ্বারাই প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করা যায়। এ ধরনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও সূফীগণের নিকট অবতীর্ণ ওহীর দ্বারা সত্যতা প্রতিষ্ঠা ও প্রকৃত আকাঈদতত্ত্ব নির্ধারণ করা যায়।

ইমাম গাযালী তাঁর চিন্তাধারা, দার্শনিক অনুসন্ধান ও অধ্যয়নের ফলে তাসাউফের উচ্চমার্গে অবস্থান লাভ করেন। তাঁর সাহায্যে গ্রিক যুক্তিতর্কের সংশোধিত ও পরিমার্জিত নীতি-পদ্ধতি মুসলিম চিন্তা জগতে স্বীকৃতি লাভ করে এবং ইসলামী আকাইদ সঠিক অবস্থানে উপনীত হয়। গ্রিক যুক্তিপ্রণালি ব্যবহার করে তিনি 'স্বকীয় মৌলিকতা' নামে একটি প্রয়োগিক পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করেন।

ইমাম গাযালী মূলত ছিলেন জ্ঞান সংস্কারক। ইসলামে তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে, তিনি এরিস্টটল প্লেটোসহ গ্রিকদর্শনের সাথে সূর মেলানো মুসলিম দার্শনিকদের দর্শনের অসংগতি তুলে ধরে ভ্রান্ত মতবাদ থেকে ইসলামকে হেফাজত করেন। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল স্রষ্টার অস্তিত্ব, ক্ষমতার পরিধি, সৃষ্টির রহস্য, পৃথিবী ও মহাজাগতিক বিষয়াবলির আলোচনা, যা মুসলিম সমাজের বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করে। তিনি সেগুলোকে যুক্তিতর্ক, বোধ ও তত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিহত করে সঠিক ধারণা প্রতিস্থাপন করেন। যা সাধারণ পণ্ডিতদের পক্ষে ছিল অসম্ভব। একইভাবে তাসাউফ, ইসলামী আকিদা, রাষ্ট্রচিন্তা ও আখলাকী বিষয়ে কিছু মৌলিক ও নীতি নির্ধারণী জ্ঞান রেখে যান। যা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য হিদায়াতের আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করে। দ্বীনের খিদমতে নিজের অস্তিত্বকে উজাড় করে লেখন, বক্তব্য, খানকা, নসীহত, বাহাস-মুনাযারা, সফর, কোনো কিছুই বাদ রাখেননি। ইমাম গাযালী (র.) ফিকহের গঠন যুগের একজন শীর্ষস্থানীয় আলিম ছিলেন। তিনি ফিকহশাস্ত্রকে এক নতুন উচ্চতায় নেওয়ার চেষ্টা করেন। তাঁর মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম শাফিঈ (র.)-এর অনুসরণে তিনি এই কাজে অগ্রসর হন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন দ্বীনের সমূহ বিষয় যাচাই বাছাই করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী ও একজন মুজতাহিদ। উসূলে ফিকহ ও আকাইদের ক্ষেত্রে ইমাম শাফিঈর সঙ্গে তার অধিকাংশ মিল ছিল। তিনি প্রকাশ্যে প্রচার করেন যে, যারা ইসলামের মূল নীতিমালা স্বীকার করে চলে, তারাই মুমিন বা বিশ্বাসী। তাঁর মতে ধর্মীয় নিশ্চয়তার আদি ভিত্তি হলো সন্তোষজনক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। এরূপ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মুমিনই অটল মুমিন। তিনি আরো বলেন, অজ্ঞ জনসাধারণের ধর্ম রক্ষায় রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের সচেষ্ট থাকা উচিত। একজন উচ্চ মর্যাদাশীল আলিম ও প্রচারক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করার কারণে তাঁর সংস্কার নীতিগুলো কার্যকরী হয়। তাঁর প্রস্তাবিত নীতিগুলো আলিমগণের ইজমা বা ঐক্যমতে রূপলাভ করেছিল। তিনি কেবল মুজাদ্দিদ নয় বরং সুষ্ঠু ভিত্তির উপর ইসলামের পুনস্থাপক হিসেবেও মর্যাদা লাভ করেন। তিনি গ্রিক প্রভাবে সংক্রমিত ইসলামী দর্শনেরও অসারতা প্রমাণ করেন। তাছাড়া দর্শনকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় ব্যাপারে যে সকল রহস্যাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল তাকে পুরোপুরি নস্যাৎ করে দেন। তিনি প্রকাশ করেন যে,

দর্শন নিছক একটি চিন্তাধারা মাত্র। যে কোনো সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ তা উপলব্ধি করতে পারে। তাঁর মতে দর্শনের মাধ্যমে পরম ও চরম সত্যে পৌঁছানো অসম্ভব। কেবল চিন্তাকে কেন্দ্র করে অধিবিদ্যা (Mataphysics) গড়ে উঠতে পারে না। বরং আধ্যাত্মিক জ্ঞানই চরম সত্য। তাঁর যুক্তিতর্কে অভিভূত পরবর্তী দার্শনিকগণ অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিলেন যে, গাযালীর মতো একজন দর্শনজ্ঞানী ব্যক্তি তাসাউফ সাধনায় সূফী হলেন কেমন করে তাঁর এই মতবাদ পরবর্তী আশয়ারী চিন্তাধারা পূর্ণতা লাভ করে। তাঁর ভাবধারা ইউরোপীয় চিন্তাধারায় প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং আধুনিক যুগেও সে প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাঁর চিন্তাধারায় ইউরোপের Ramon Martin রচনা করেন Pugio Fedeli. এর দ্বারা Thomas Aquinas এবং পরবর্তীকালে Pascal প্রমুখ প্রভাবিত হন ।

ইমাম গাযালী তাঁর চিন্তাধারাগুলোর স্থায়িত্ব প্রদান এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য রেখে যেতে প্রায় চারশত গ্রন্থ রচনা করেন। উল্লেখযোগ্যগুলোর একটি বিবরণ তুলে ধরছি:

প্রথমত: ইসলামী আকীদা ও বিশ্বাসকে রক্ষা ও বিধর্মী বিভ্রান্ত দার্শনিকদের আক্রমণের জবাব এবং ইসলামী দর্শন বিষয়ে সঠিক ধারণা দিতে তিনি রচনা করেন, মাকাসিদুল ফালাসিফা, তাহাফুতুল ফালাসিফা, আল মুনক্বিয মিনাদ্ব-দ্বালাল, নিযামুল আ'লাম। কিতাবগুলো বহুকাল ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য হিসেবে সমাদৃত ছিল। আজও দর্শনশাস্ত্রের রেফারেন্স বুক হিসেবে গণ্য হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত: ইসলামের অভ্যন্তরে বাতিল ফিরকার জবাব এবং আকিদা ও ফিকহী বিধানসমূহের ক্ষেত্রে মতবিরোধ নিরসনে উসূলে ফিকহ বিষয়ে তিনি রচনা করেন, তাহসিনুল মা'খায, শিফাউল আলীল, মুনতাখাল ফি ইলমিল জাদাল, আল মানখুল, মুখতাছফা মা'খায ফিল খিলাফিয়াত, মুফাসসালুল খিলাফ ফি উসুলিল কিয়াস ইত্যাদি।

তৃতীয়ত: ইলমুল কালাম বা তর্কশাস্ত্রের উন্নতির ফলে বিরুদ্ধবাদী কর্তৃক ইসলামের বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক ইবাদত বিষয়ে আরোপিত অভিযোগ ও অনুযোগের জবাব দেওয়ার জন্য তিনি রচনা করেন, ইলযামুল আওয়াম, ইখতিছারুল মুখতাছার লিল মাআনি, আল কিসতাসুল মুসতাকিম, ফাদ্বাইলুল এবাহিয়্যাহ, আল কাওলুল জামিল ফির রদ্দে আলা মান গায়্যারাল ইনজিল, আল মাওয়াহিবুল বাতিনিয়্যাহ, আততাফরিকাহ বাইনাল ইসলামী ওয়া যানদাকাহ, আররিসালাতুল কুদসিয়্যাহ, কিতাবুর রূহ, আল ইকতিছাদ ফিল ই'তিকাদ ইত্যাদি।

চতুর্থত: যুক্তিবিদ্যা বা মানতিক বিষয়ে মী'য়ারুল ইলম, হেমাকুন নযর, মীযানুল আমাল কিতাব রচনা করেন।

পঞ্চমত: দর্শন ও বিভিন্ন ধর্মের আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রভাবে তাসাউফ ও আখলাকী বিষয়ে ফাসাদ ও বিভ্রান্তি নিরসনে তিনি রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত ও সর্বশ্রেষ্ট কিতাব এহইয়াউ উলুমিদ্দীন। এ ছাড়াও রয়েছে কিমিয়ায়ে সাআদাত, আল মাকসাদুল আক্বছা, আখলাকুল আবরার, জাওয়াহিরুল কুরআন, জাওয়াহিরুল কুদস, মিশকাতুল আনওয়ার, মিনহাজুল আবিদীন, মি'রাজুস সালিকীন, নসীহাতুল মুলুক, আয়্যুহাল আওলাদ, বিদায়াতুল হিদায়াহ, লতাইফুল আখবার ইত্যাদি।

বিশেষত, তাঁর এহইয়াউ উলুমিদ্দীন গ্রন্থটি ইলমে দ্বীনের একটি অদ্বিতীয় বাহন। এটি তাঁর যাবতীয় অধিত ও অর্জিত বিদ্যা তথা দর্শন, কালাম, সূফীবাদ, ইলমে শরীয়াহ সব কিছুর নির্যাস, যার প্রথম অংশে ধর্মনিষ্ঠা ও ধর্মীয় যাবতীয় ইবাদাতের সঠিক চিত্র তুলে ধরেছেন এবং দ্বিতীয় অংশে আধ্যাত্মিক ও হৃদয়ঘন যাবতীয় বিষয় সূক্ষভাবে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহর প্রতি বান্দার কর্তব্য, বান্দার প্রতি আল্লাহর অনুকম্পা, মানুষের দৈনন্দিন কার্যাবলি, মানুষকে ধ্বংসকারী ও রক্ষাকারী বিষয়াবলি, ইলম, তর্কশাস্ত্র, সূফীতত্ত্ব, দর্শন, প্রেম-ভালোবাসা, সংগীত, মানবীয় অনুভূতি ইত্যাকার সকল বিষয় লিপিবদ্ধ করেছেন। যা হৃদয়ের গভীর থেকে একজন সংশয়হীন বিশ্বাসী মানুষের জন্য এবং একজন নফসে মুতমায়িন্নাহর অধিকারী ওলি-আল্লাহর জন্য প্রয়োজন। বলা যায়, কোনো মুমিন যদি বলতে পারেন আমি এহইয়া গ্রন্থের প্রতিটি লাইন বুঝে শুনে পড়েছি এবং আমার জীবনে তা বাস্তবায়ন করেছি তবে বলা যাবে তিনি এমন স্তরে পৌঁছেছেন যাঁদের বিষয়ে আল্লাহ পাক বলেছেন, "হে প্রশান্ত আত্মাসমূহ, তোমরা তোমাদের রবের দিকে প্রত্যাবর্তন কর গভীর সন্তুষ্টচিত্তে এবং আমার প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করো।" খ্যাতনামা মুহাদ্দিস যাইনুল ইরাকী লিখেছেন, এহইয়াউ উলুমিদ্দীন এর ন্যায় গ্রন্থ পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি রচিত হয়নি। শায়খ আবু মুহাম্মদ জুরজানী আরেকটু বাড়িয়ে বলেন, জগতের সকল কিতাব যদি পুড়িয়ে ফেলা হয় আর এহইয়াউ উলুমিদ্দীন কিতাবটি অক্ষত থাকে তবে এর মাধ্যমে আমি তার পুনর্জন্ম দিতে পারব।'

ইলমে তাসাউফ ও দর্শনশাস্ত্রের এই মহান পণ্ডিত দীর্ঘজীবী হননি। মাত্র ৫৫ বছর বয়সে হিজরি ৫০৫ সালের ১৪ই জুমাদা আস-সানী মোতাবেক ১৯ ডিসেম্বর ১১১১ খ্রি. ভোরবেলা তূস নগরে ইন্তিকাল করেন। এ সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যেই তিনি প্রায় চারশত কিতাব রচনা করেন যা রীতিমত বিস্ময়কর, আল্লাহর অনুকম্পা ছাড়া কিছুই ছিল না।

আফসোসের বিষয় হচ্ছে তাঁর দার্শনিক ও আকাইদী আলোচনাগুলো পরবর্তী কতিপয় ধর্মশাস্ত্রবিদগণ বুঝতে পারেননি। অনেকে তাঁকে যিন্দিক বা মুনাফিক বলতেও দুঃসাহস দেখিয়েছিল। এমনকি তাঁর বিশাল গ্রন্থাগার পুড়িয়ে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন স্থানে তাঁর ছড়িয়ে থাকা কিতাবাদি থেকে যতটুকু উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিল সেগুলোই আমাদের হস্তগত হয়েছে।

আল্লাহর দ্বীনকে রক্ষা করার জন্য ইমাম গাযালী ছিলেন প্রকৃতপক্ষে একজন মুজাদ্দিদ ও ওলী-আল্লাহ।

মধ্যযুগে মুসলিম বিজ্ঞানী

আহসান হাবীব

মধ্যযুগ অন্ধকার নয় বরং স্বর্ণযুগ ছিল। গর্বের সাথে বলি যে, এই আধুনিক বিজ্ঞানের জন্মদাতা আমরাই। শিক্ষা ও বিজ্ঞানের উন্নয়নে এবং জ্ঞান গবেষণার নতুন নতুন অভিধার তালাশে মুসলিম বিজ্ঞানী ও মনীষীরা পৃথিবীর সামনে জ্বালালেন এমনই দীপ্ত শিখা যা সেই নবম-দশম শতক থেকে ১৮শ-১৯শ শতক পর্যন্ত দীর্ঘকাল পরিক্রমায় যুক্ত করল এক অনন্য মাইলফলক। আধুনিক বিজ্ঞানও আবিষ্কার যুগের পথিকৃৎ হয়ে রইলেন সেই যুগ প্রবর্তক বিজ্ঞানীগণ। আধুনিক বিজ্ঞান শুধু চমকপ্রদ আবিষ্কারের জন্যই নয়, তার নিজের অস্তিত্বের জন্যই মুসলমানের কাছে ঋণী। অমুসলিম অনেক সুধীজন মধ্যযুগকে অন্ধকার যুগ বলেছেন। হয় অজ্ঞতা, নয় হীনমন্যতা বশত তারা একথা বলেন। সময়টি ছিল প্রকৃতপক্ষেই আধুনিক সভ্যতার সূতিকাগার। পবিত্র কুরআনে কারীম নিজের বক্তব্য মতেই বিজ্ঞানময়। এ বিষয়ে গবেষক ড. মরিস বুকাইলি তার 'বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান' গ্রন্থে স্বীকারোক্তি করেন "কুরআনে এমন একটা বক্তব্যও নাই- যে বক্তব্যকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিচারে খণ্ডন করা যেতে পারে"

পবিত্র গ্রন্থের এই অভ্রান্ততার ও বিজ্ঞানময়তার খবর মুসলিম গৌরবময় যুগের পরে মুসলিম জাতি ভুলে রইলেও ভুলে থাকেনি পাশ্চাত্য। ল্যাটিন, জার্মান প্রভৃতি ভাষায় কুরআনের প্রচুর অনুবাদ হয় এবং তারা কুরআন গবেষণার মাধ্যমে প্রচুর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও আবিষ্কার পৃথিবীকে উপহার দিতে সক্ষম হয়। মানুষ জানত মানুষের কথা বাতাসে হারিয়ে যায়। কিন্তু কুরআনের মাধ্যমে পাশ্চাত্য প্রথম জানল যে, মানুষের উৎক্ষিপ্ত কথা বাতাসে ভেসে বেড়ায়। ইরশাদ হচ্ছে 'একদিন সব কিছুই প্রকাশিত হয়ে পড়বে, তোমার প্রতিপালকের আদেশ অনুযায়ী।' (সূরা যিলযাল: ৪-৫) এই আয়াতে বাতাসে সব কথা বাণীবদ্ধ হয়ে থাকার ইংগিত করা হয়েছে। একই সাথে বিশ্বনবী (সা.) এর বাণী, 'তোমরা দুটি জিনিসের ব্যাপারে সতর্ক থাক। একটি তোমাদের স্ত্রীরা, অন্যটি এই পৃথিবী যার উপর তোমরা আস্ফালন করে চলছ।' (মুসলিম)

এই হাদীসে মানুষের কথা রেকর্ড হয়ে থাকার ইংগিত দেওয়া হলো। সুতরাং বেতার আবিষ্কারের বহু শতকের সাধনা এই বাণীগুলোতে নিহিত এবং পাশ্চাত্য যথার্থভাবে তা কাজে লাগিয়েছে। একইভাবে মহাকাশ, চন্দ্র সূর্যের পরিভ্রমণ, মধ্যাকর্ষণ শক্তি, মানুষ ও জীবের সৃষ্টি-প্রক্রিয়া, উদ্ভিদ, প্রাণী ও রসায়ন প্রভৃতি বিষয়ের বেশির ভাগই পবিত্র কুরআনে উল্লেখ ছিল হাজার বছর আগেই। মুসলিম জাতি তাদের বৈজ্ঞানিক বিপ্লব সংঘটিত করেছিল কুরআনের বলেই, এই গ্রন্থ ছিল তাদের মূল প্রাণশক্তি। বিজ্ঞানের এমন কোনো শাখা নেই যেখানে মুসলিম মনীষীদের হাতের ছোঁয়া লাগেনি। তাদের রচিত কালজয়ী গ্রন্থগুলো শত শত বছর ধরে ইউরোপে পাঠ ছিল। ইবনে সীনা, আল রাজী, আবুল কাসেম জাহারাভী, ইবনুল হাইছাম জারকালী, জাবির বিন হাইয়ান, মুসা আল খারেজমী ও ইবনে নাফিস প্রমুখ তাদের মধ্যে অন্যতম।

আধুনিক ইউরোপ এ সকল বিজ্ঞানীদের প্রতি প্রণত হয়েছেন ও খোলাখুলি স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। আবার মুসলিম বিজ্ঞানীদের অনেক আবিষ্কারকে আত্মস্থ করতেও কুণ্ঠিত হয়নি পাশ্চাত্য। তারা এসব পুরোধা ব্যক্তিত্বদের নাম বিকৃত করেছেন, কৃতিত্ব ঢেকে দিয়েছেন নানা জাল বিছিয়ে। অসংখ্য মুসলিম মনীষীদের নাম ও রচনাবলি পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেছে।

বিজ্ঞান জগতে ৭৫০ থেকে ১১০০ খ্রিষ্টাব্দ এই সাড়ে তিনশত বছর মুসলিম জাতির শ্রেষ্ঠ যুগ চিহ্নিত হয় । অথচ এই উত্তরাধিকার কাজে লাগাতে ইউরোপকে ১৯শ-২০শ শতাব্দী পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলো। স্পেনে যদি মুসলমানরা ঢুকতে না পারত তাহলে আধুনিক সভ্যতা আরো কয়েক শতাব্দী পিছিয়ে যেত। মুসলিম শাসন হারিয়ে গেছে, সাথে হারিয়ে গেছে জ্ঞান বিজ্ঞানের স্বর্ণ যুগ। আমরা তা পুনরুদ্ধার করতে পারিনি।

পাশ্চাত্য জগৎ আজ বিজ্ঞানকে উন্নতির যে চরম শিখরে পৌছিয়েছে, তার ভিত্তিই হলো মধ্যযুগীয় মুসলিম বিজ্ঞানীদের আত্মত্যাগ ও পরিশ্রম। বিজ্ঞানের এই ক্রমবিকাশে পাশ্চাত্য জগৎ তাই বহুলাংশে মধ্যযুগীয় মুসলিম বিজ্ঞানীদের কাছে ঋণী। এটা কেবল মুসলমানদের বক্তব্য নয়, পাশ্চাত্য জগৎও এটি স্বীকার করে মুক্ত কণ্ঠেই।

উইল ডুরান্ট তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'দা স্টোরি অব সিভিলাইজেশন' এর ৪র্থ খণ্ডে অনিবার্যভাবেই মুসলিম বিজ্ঞানী, দার্শনিক এবং চিকিৎসকদের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। ডুরান্টের মতে, 'ইবনে সিনা ছিলেন ওষুধ বিষয়ক মহত্তম লেখক, আল-রাজী ছিলেন মহত্তম চিকিৎসক, আল-বিরুনী মহত্তম ভূতত্ত্ববিদ, আল-হায়তাম ছিলেন মহত্তম চক্ষু বিশেষজ্ঞ এবং জাবির ছিলেন মধ্যযুগের সম্ভবত সেরা রসায়নবিদ।'

মুসলিম জাতি যখন জীবনের সার্বিক ক্ষেত্রে উন্নতির চরম শিখরে পৌছে, তখন তারা ক্লান্ত হয়ে ভোগ বিলাসে মত্ত হয়ে পড়ে। ফলে জ্ঞান চর্চার প্রদীপও ম্লান হয়ে আসতে থাকে। ভাটা পড়তে থাকে তাদের সৃজনশীল কর্মতৎপরতায়। অন্যদিকে পাশ্চাত্য জগৎ মুসলিম বিজ্ঞানীদের লব্ধ জ্ঞানের পরিচর্যা করে ধাপে ধাপে উন্নতির চরম সোপানের দিকে এগুতে থাকে। ইউরোপীয়রা মুসিলম দেশগুলো একে একে গ্রাস করে তাদের কৃষ্টির প্রসার ঘটাতে থাকে। এমন সময়ে সমর্থনের পরিবর্তে মুসলিম বিজ্ঞানীদের উপর নেমে আসে চরম বাধা-বিপত্তি। তাই ক্রমেই তাদের কর্মতৎপরতা বন্ধ হয়ে যেতে থাকে এবং তারা হারিয়ে যেতে থাকেন বিজ্ঞানের জগৎ থেকে। মুসলিম বিজ্ঞানীদের অসমাপ্ত কাজকে এগিয়ে নিয়ে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরা আজ বিজ্ঞানের কর্ণধার সেজেছে। তবু অকপটে তাদেরকেও স্বীকার করতেই হবে সেইসব মধ্যযুগীয় মুসলিম বিজ্ঞানীদের কথা, যারা বিজ্ঞানের এই উন্নতির জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাদেরই কয়েকজনের কথা উল্লেখ করছি।

১. আবূ যায়দ আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে খালদুন: তিনি প্রাচীন ঐতিহাসিকদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। মনে করে থাকেন, তিনি হলেন ইবনে খালদুন। 'আল ইবারওয়া

দিওয়ান আল মুবতাদা ওয়াল খবর' (The Moral and the Book of the Subject and Object) গ্রন্থে তিনি জাতিসমূহের বিবর্তন এবং গঠন সম্পর্কে ঐতিহাসিক সূত্রের উদ্ভাবন করেন। এজন্য তাকে সমাজ বিজ্ঞানের জনক বলা হয়।

২. আবুল ওয়ালিদ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে রুশদ: মুসলিম দার্শনিকদের মধ্যে ইউরোপে তার বিশেষ আধিপত্য ছিল। তিনি এরিস্টটলের দর্শনের সবচেয়ে বড় অনুবাদক ও ব্যাখ্যাকার।

৩. আবূ আলী আল হুসায়ন ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে সিনা: তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। তার লিখা 'আল কানুন ফিল তিব' গ্রন্থখানা উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত ইউরোপীয় চিকিৎসকদের অন্যতম প্রধান পাঠ্যপুস্তক ছিল। তিনি প্রথম মনস্তত্ত্ব সম্পর্কিত ধারণা উদ্ভাবন করেন। তিনি বিভিন্ন প্রকার রোগ এবং ৭৬০ প্রকার প্রতিকার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। তিনি যক্ষা, মস্তিস্কবিল্লির প্রদাহ ও অনুরূপ আরো কয়েকটি সংক্রামক রোগের চিকিৎসা উদ্ভাবন করেন।

৪. আবূ রায়হান মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল বিরুনী: গণিত, ভূগোল, ইতিহাস, জ্যোতির্বিদ্যা এবং ভেষজ শাস্ত্রের উপর শতাধিক গ্রন্থ প্রণেতা। ভারতবর্ষের উপর 'কিতাবুল হিন্দ' নামক অমর গ্রন্থ সভ্যতার ইতিহাসে এক অমূল্য সংযোজন। বৃত্তের ব্যাসার্ধ নির্ণয়ের জন্য তিনি যে পন্থা উদ্ভাবন করেন তা 'বিরুনী পদ্ধতি' নামে খ্যাত। তিনি Sine এবং Tangent এর ছক তৈরি করেন। তরল পদার্থের চাপের প্রকৃতি নির্ণয় সম্পর্কেও তিনি ধারণা দেন। তিনি সমুদ্রের পানি থেকে লবণ উদ্ভাবনের প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেন।

৫. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে মূসা আল খাওয়ারিজমী: অংক শাস্ত্র ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য খলিফা মামুন তাকে বায়তুল হিকমার প্রধান নিযুক্ত করেন। তিনি লগারিদমের প্রকৃত উদ্ভাবক। গণিত শাস্ত্রের উপর লেখা তার অনেক বই ল্যাটিন ও ইংরেজি ভাষা অনূদিত হয়ে ইউরোপে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়।

৬. আবূ মূসা জাবির ইবনে হাইয়ান আল তুসী: তিনিই সর্বপ্রথম এসিড আবিষ্কারক এবং সালফিউরিক এসিড তরলীকরণে সাফল্য অর্জন করেন। সোডিয়াম কার্বনেট, পটাশিয়াম, আর্সেনিক এবং সিলভার নাইট্রেট উদ্ভাবন তার এক অমূল্য আবিষ্কার। তাকে আধুনিক রসায়ণবিদদের একজন ধরা হয়। তার রচিত ৫০০ বইয়ের মাঝে দর্শন, তর্ক ও রসায়ন শাস্ত্রে আমরা মাত্র ৮০টি সম্পর্কে জানি।

৭. মুহাম্মদ ইবনে জাবির ইবনে সিনান আল বাত্তানী: তিনি একজন শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ হিসাবে পাশ্চাত্য জগতে বিশেষভাবে সমাদৃত। বিবিধ ত্রিকোণোমিতিক সমীকরণ সমাধান তার উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার। তিনি এর গাণিতিক ছক প্রস্তুত করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই ত্রিকোণমিতি শাস্ত্রের জন্মদাতা। কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত তার গ্রন্থগুলো রেফারেন্স বই হিসেবে পঠিত হতো।

৮. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ আল ইদরিসি: তিনি ছিলেন ভূগোলবিদ, বিজ্ঞানী ও মানচিত্রাঙ্কনবিদ। তিনিই সর্বপ্রথম পৃথিবীর মানচিত্র অংকন করেন, যা যথার্থতার দিক থেকে আধুনিক মানচিত্রের কাছাকাছি ছিল। তিনি সমান্তরাল সরল রেখা দিয়ে পৃথিবীকে ৭টি ভাগে ভাগ করেন। তার বিখ্যাত বই 'নুগহাত আল মোস্তফা কিফ ইখতিরাক আল অরফাক' তিন শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের প্রধান ভৌগলিক গ্রন্থ হিসেবে পরিগণিত হতো।

৯. জিয়াউদ্দিন আবূ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল বিতার: এই বিজ্ঞানী জীববিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের দিকে তিনি বিশেষভাবে মনোযোগী ছিলেন। তার বিখ্যাত বই 'আল জামি লি মোফরাদাত আল আদওয়াইয়া ওয়াল আগদিয়ে' ১৮৮১ সালে ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত হলে ফরাসী বিজ্ঞানীরা এমন ৮০টিরও বেশি বিষয়ের সাথে পরিচিত হন যা ইতিপূর্বে তাদের অজানা ছিল। এই অভিধানটি বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো হয় এবং এতে ১৪০০ প্রকার ওষুধের বর্ণনা ছিল। যার ৩০০টি এর আগে কখনো জানা ছিল না।

১০. আবূ আলী আল হাসান ইবনে হাইসাম: দৃষ্টিবিজ্ঞান ও আলোকরশ্মি সংক্রান্ত গবষেণায় তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তিনিই সর্বপ্রথম চোখের ছবি অংকন করে আলোকের প্রতিফলন ও প্রতিসরণের নিয়মাবলি ব্যাখ্যা করেন। তিনি চোখের কাঠামোতে আলোর প্রতিফলন, কর্নিয়ার উপর পতিত ছবি, আলোকরশ্মি একত্রীকরণের সূত্র, কোন ছবির সম্প্রসারণ, প্রতিফলন এবং সংযুক্ত এবং বস্তুর রং পরিদর্শন ইত্যাদি ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। মানুষের চোখের সাথে ক্যামেরার সাদৃশ্যও আবিষ্কার করেন তিনি। ১০৩৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

জো বাইডেন: কেমন হবে মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক

রহমান মোখলেস

আগামী ২০ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের ৪৬তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে অভিষেক হচ্ছে দেশটির নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জো বাইডেনের। এর আগে দেশটির বিদায়ী রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভোটের ফল উল্টে দিতে সব রকমের চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হন।

এখন কেমন হবে জো বাইডেনের সামনের দিনগুলো? তাঁর বিদেশ নীতি বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কেমন হবে? প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাঁর চার বছরের শাসনামলে মুসলিম বিশ্বে দ্বিমুখী নীতি অনুসরণ করেছেন। অবশ্য এটি তাঁর নিজ স্বার্থেই। তিনি একদিকে যেমন চীনের জিংজিয়াংয়ের নিপীড়িত উইঘুর মুসলিমদের বিষয়ে সোচ্চার ছিলেন, অন্যদিকে কাশ্মীরের মুসলমানদের বিষয়ে তিনি ছিলেন প্রায় নিশ্চুপ কিন্তু সবচেয়ে ক্ষতি করেছেন ফিলিস্তিনিদের। পূর্ব জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি, তেলআবিব থেকে মার্কিন দূতাবাস পূর্ব জেরুজালেমে স্থানান্তর, দখলকৃত সিরিয়ার গোলান মালভূমিকে ইসরায়েলের বলে স্বীকৃতি, অধিকৃত পশ্চিম তীরে ইসরায়েলের অবৈধ বসতি নির্মাণকে জায়িয এবং সবশেষে ফিলিস্তনের স্বার্থ বিরোধী ইসরায়েলের সাথে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও বাহরাইনের চুক্তি সব কিছুই করেছেন তিনি। ট্রাম্প অবশ্য মিয়ানমারে গণহত্যার শিকার রোহিঙ্গা মুসলিমদের বিষয়ে খুব জোরালো না হলেও মাঝেমধ্যে মিয়ানমারের দুই একজন সেনা কর্মকর্তার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে দায় সেরেছেন। ইরানের বিরুদ্ধে ট্রাম্প ছিলেন একেবারে খড়গ হস্ত। একের পর এক নিষেধাজ্ঞা আরোপ ও ইরানের সম্পদ জব্দ করেছেন।

কোন দিকে গড়াবে মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি:

ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রেখে তার মধ্যপ্রাচ্য নীতিকে ঢেলে সাজিয়েছিলেন। ট্রাম্পের বিদায়লগ্নেও গত ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে তাঁর নিজ জামাতা ও মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক বিশেষ দূত জারেড কুশনারকে মধ্যপ্রাচ্যে পাঠিয়েছিলেন। ট্রাম্পের পুরো আমল জুড়েই সৌদি আরব এবং দেশটির যুবরাজ মুহাম্মদ বিন সালমান বিশেষ সুবিধা ভোগ করেছেন। কিন্তু ইরানের সাথে ট্রাম্পের সম্পর্ক ছিল সাপে-নেউলে। ইরানকে জব্দ করতে শুধু একের পর এক নিষেধাজ্ঞাই আরোপ করেননি, পারস্য উপসাগরে মোতায়েন করেছেন বিমানবাহী রণতরি। সেখানে প্রায়ই চলে মার্কিন যুদ্ধ জাহাজের মহড়া। গত জানুয়ারির শুরুতে বাগদাদ বিমানবন্দরে বোমা হামলায় ইরানের শীর্ষ জেনারেল কাসেম সোলাইমানিকে হত্যা করেছেন ট্রাম্প। গত মাসে ইরানের পরমাণুবিজ্ঞানী মোহসেন ফাখরিজাদেহকে হত্যার বিষয়ে ইসরায়েলকে ট্রাম্পই মদদ দিয়েছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া কিছুদিন আগে ইরানের প্রধান পরমাণু স্থাপনায় বিস্ফোরণের ঘটনায়ও ট্রাম্প তথা যুক্তরাষ্ট্রের হাত ছিল বলে ধারণা করা হয়।

ওদিকে তুরস্কের সাথেও ট্রাম্পের সম্পর্ক ভালো ছিল না। ইসরায়েলের সাথে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ওমানের সাথে শান্তি চুক্তির ঘোর বিরোধী তুরস্ক। এ সব প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখেই মার্কিন নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা গ্রহণ করছেন। ট্রাম্প আমলে মধ্যপ্রাচ্যে যে নজিরবিহীন পরিবর্তন তা কি বাইডেন ধরে রাখবেন, না পরিবর্তন আনবেন। অবশ্য বাইডেন আগেই জানিয়েছেন, ট্রাম্প আমলে যে সব মুসলিম দেশের জনগণের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল, তা তিনি বাতিল করবেন।

ট্রাম্পের নেতৃত্বাধীন প্রশাসন থেকে ব্যাপক রাজনৈতিক ও সামরিক সমর্থন পেয়েছে সৌদি আরব। সৌদি নেতৃত্বে উপসাগরীয় দেশগুলোকে কাছে টানার চেষ্টা করেছে। এ সবই করেছে উপসাগরীয় অঞ্চলে একটি ইরান বিরোধী জোট গঠনের জন্য। ইরানকে রুখতে সৌদি আরবও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করেছে। এদিকে তালেবানের সঙ্গেও সম্পর্ক উন্নতির চেষ্টা করেছে। গত ফেব্রুয়ারিতে তালেবান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির আলোকেই এখন আফগান সরকার ও তালেবানের মধ্যে সরাসরি আলোচনাও শুরু হয়েছে। আফগানিস্তানে তিন দশকের যুদ্ধ অবসানে চলছে জোর চেষ্টা। তবে এই শান্তি আলোচনার মাঝেই তালেবান ও আফগান সরকারের মধ্যে হামলাও অব্যাহত রয়েছে। এ সবের মাঝেই আফগানিস্তান ও ইরাক থেকে সেনা কমানোর ঘোষণা দিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন।

কোনো সন্দেহ নেই ট্রাম্প আমলে মুসলিম বিশ্বে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে মধ্যপ্রাচ্যে। এখন জো বাইডেন আমলে পরিস্থিতি কোন দিকে গড়াবে এটাই দেখবার বিষয়। বাইডেন চাইবেন মধ্যপ্রাচ্যে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির গণতন্ত্রসুলভ আচরণ। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যে প্রধান সংকটই গণতন্ত্রের। নির্বাচনী প্রচারের সময় জো বাইডেন বলেছিলেন, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্ব পাবে মানবাধিকার ইস্যু। এ নীতি বাস্তবায়ন হলে ব্যাপক প্রভাব পড়বে একনায়কতান্ত্রিক মুসলিম দেশগুলোয়। তবে ধারণা করা যায়, কয়েকটি দেশের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের উন্নতি হবে। আবার কয়েকটি দেশের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটবে।

সম্প্রতি লেবাননের সংবাদপত্র আন্নাহার আল আরাবির কলাম লেখক হিশাম মেলহেম তাঁর এক নিবন্ধে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটরা জয়ী হলে সৌদি আরব, মিসর, এবং তুরস্কের শাসকদের জন্য ওয়াশিংটনে কোনো বন্ধু থাকবে না বললেই চলে। কিন্তু তাঁর এ কথা শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি ঠিক নাও হতে পারে। এ কথা সত্যি যে, এই তিন দেশেরই মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে। তুরস্কে সরকারবিরোধী রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের ওপর দমন-পীড়ন চলছে। অভ্যুত্থানে জড়িত

থাকার অভিযোগ এবং যুক্তরাষ্ট্রে স্বেচ্ছা নির্বাসিত দেশটির ধর্মীয় নেতা ফাতহুল্লাহ গুলেনের সমর্থক বিপুল সংখ্যক সেনা ও বেসামরিক ব্যক্তিকে জেল অথবা মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান। এ ছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে বিচ্ছিন্নতাবাদী কুর্দিদের ওপর হামলা ও নির্যাতনের। অন্যদিকে এরদোয়ান ইসরায়েলের ঘোর বিরোধী ও ফিলিস্তিনের জোরালো সমর্থক। তিনি ইসরায়েলের সাথে আমিরাত ও বাহরাইনের শান্তি চুক্তির ঘোর বিরোধী এবং এ ব্যাপারে সরব কণ্ঠ।

এদিকে মিসরের পরিস্থিতিও খুব ভালো নয়। সেখানেও চলছে ভিন্নমতাবলম্বীদের দমন-পীড়ন ও কারাদণ্ড। তা সত্ত্বেও মিসরের সঙ্গে বাইডেন আমলে সম্পর্ক ততটা খারাপ হবে না বলেই মনে করেন বিশ্লেষকেরা। কারণ ভূরাজনৈতিক স্বার্থ। নিজে সরে গিয়ে নিশ্চয়ই সেখানে চীন ও রাশিয়াকে তিনি ঢুকতে দেবেন না।

নতুন বাস্তবতার মুখোমুখি সৌদি আরবঃ

নতুন পরিস্থিতিতে সৌদি আরবের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক স্বাভাবিক থাকবে কি? রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে আগের মতো সৌদি আরবের সাথে সম্পর্ক ততটা স্বাভাবিক কিংবা উজ্জ্বল নাও থাকতে পারে বাইডেন প্রশাসনের। সৌদি-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের পুনর্মূল্যায়ন হতে পারে। কারণ সৌদি আরবের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে এমনিতেই মার্কিন ডেমোক্র্যাটরা সোচ্চার। বিশেষ করে যুবরাজ সালমানের জন্য বাইডেন প্রশাসন কিছুটা ক্ষতির কারণ হতে পারে।

সৌদি সাংবাদিক জামাল খাশোগি হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার সন্দেহের তীর যুবরাজ সালমানের দিকে থাকলেও ট্রাম্প এ বিষয়টি এড়িয়ে গিয়ে যুবরাজকে বিশেষ সুবিধা দিয়েছেন।

ইয়েমেনে সৌদি মিত্র জোটের হামলা সত্ত্বেও সৌদি আরবে মার্কিন অস্ত্র বিক্রি বাড়িয়েছেন। বিনিময়ে যুবরাজ সালমানও বহু শরয়ী নীতি শিথিল করেছেন। সৌদি নারীদের গাড়ি চালানোর অধিকার, বিদেশি অবিবাহিত নারী-পুরুষের একই হোটেল কক্ষে থাকার অনুমতি, এমনকি নারীদের ফুটবল খেলারও অনুমতি দিয়েছেন। এভাবে সালমান ট্রাম্প প্রভাবে সৌদি নীতিতে নজিরবিহীন পরিবর্তন এনেছেন। এক কথায় ট্রাম্পের সাথে সৌদি বাদশাহ এবং যুবরাজের সম্পর্ক ছিল খুবই সৌহার্দপূর্ণ। কিন্তু বাইডেন এখন কীভাবে এগোবেন? বাইডেন সৌদি আরবকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্র হিসেবেই দেখে থাকেন। এ ব্যাপারে কূটনীতিক মহলও মনে করেন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট থেকে যুবরাজ সালমানের সুবিধা পাওয়ার দিন শেষ। এখন সৃষ্টি হবে দর কষাকষি পরিস্থিতির। এ বিষয়ে যুবরাজ মুহাম্মাদ বিন সালমানও বেশ সচেতন। তিনি নিশ্চয়ই নিজেকে কিছুটা বদলানোর চেষ্টা করবেন। ইতোমধ্যেই কাতারের সঙ্গে দ্বন্দ্ব মিটিয়ে ফেলার বিষয়ে তাঁকে আগ্রহী দেখাচ্ছে। প্রতিদ্বন্দ্বী তুরস্কের সঙ্গেও ঝামেলা মিটিয়ে ফেলতে চাইছেন। তুরস্কের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে আড়ালে যোগাযোগও শুরু হয়েছে।

সম্পর্ক উন্নতি হতে পারে ইরানের সঙ্গেঃ

ধারণা করা হচ্ছে ট্রাম্পের ইরান নীতি থেকে সরে এসে সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার নীতিকেই অনুসরণ করবেন জো বাইডেন। ট্রাম্প গত চার বছরে ইরানের সঙ্গে যে নীতি অনুসরণ করে এসেছেন, তাতে দুই দেশের সম্পর্ক এখন তলানিতে। জো বাইডেন ইরানের সঙ্গে নতুন করে সম্পর্ক স্থাপন করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। এ ছাড়া ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্প্রতি ঘোষণা দিয়েছেন, ইরানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হলে ইরান পুনরায় পরমাণু চুক্তির শর্তসমূহ পালনে ফিরে আসবে। নির্বাচনের পূর্ব থেকে বাইডেনও বলে এসেছেন, জিতলে তিনি ইরানের সাথে ছয়টি দেশের করা পারমাণবিক চুক্তিতে আবারো যোগ দেবেন। সাবেক ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট ওবামার উদ্যোগে এই চুক্তি হলেও ২০১৮ সালে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ঐ চুক্তি থেকে বের হয়ে আসেন। এদিকে ইরানের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার কিংবা শিথিলের বিষয়ে ইউরোপীয় দেশগুলোরও চাপ রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ওপর। কিন্তু জো বাইডেনের পক্ষে তা করা কতটা সম্ভব হবে তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে বিশ্লেষকদের মনে।

পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কঃ

ট্রাম্প আমলে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক যেমন খুব উন্নতি হয়নি, তেমনি খুব অবনতিও হয়নি। যদিও সন্ত্রাসীদের আশ্রয়, সন্ত্রাসী হামলায় মদদ ও অর্থায়ন ইত্যাদি অভিযোগ ও বরাবরই চাপ ছিল পাকিস্তানের ওপর। সাময়িকভাবে আর্থিক সহায়তাও এক সময় স্থগিত ছিল। ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের ভূরাজনৈতিক স্বার্থেই যেমন সৌদি আরব, উপসাগরীয় দেশগুলো এবং ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি ঘটিয়েছে, তেমনি একই কারণে ইরানকে করেছে কোনঠাসা, পাকিস্তানকে রেখেছে চাপে। কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের কণ্ঠ সব সময় সোচ্চার থাকলেও ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের কারণে যুক্তরাষ্ট্র কিংবা ট্রাম্প এ নিয়ে কখনই সরব হয়নি। যেটা সরব হয়েছে উইঘুর মুসলিমদের নিয়ে। আগামীতেও ভারতীয় বংশোদ্ভূত ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের কারণে পাকিস্তানের চেয়ে ভারতের সঙ্গেই যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক থাকবে উজ্জ্বল। কাশ্মীর পরিস্থিতি নিয়েও ততটা সোচ্চার হবে না যুক্তরাষ্ট্র। চীনকে মোকাবিলায় ভারত অনেকদিন ধরেই যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত সহযোগী। সেই নীতিতে পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। ভাগ্য পরিবর্তন হবে কি ফিলিস্তিনের?

১৯৬৭ সালে যুদ্ধে পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেম দখল করে নেয় ইসরায়েল। তখন থেকেই এখানে অবৈধ বসতি গড়ে তুলছে দেশটি। বর্তমানে এসব বসতিতে বাসিন্দার সংখ্যা প্রায় ৭ লাখ। এদিকে ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরে অবৈধ ইহুদি বসতি সম্প্রসারণে এক নতুন পরিকল্পনা নিয়েছে ইসরায়েল। এই পরিকল্পনার আওতায় এই এলাকায় নতুন নতুন মহাসড়ক, পাতালপথ ও ওভারপাস নির্মাণ করবে দেশটি। এ পরিকল্পনা কার্যকর হলে কয়েক বছরের মধ্যে ওইসব বসতির বাসিন্দারা জেরুজালেম ও তেলআবিবে অবাধে যাতায়াত করার সুযোগ পাবেন। অন্যদিকে নিজেদের শহরগুলোর এক বিরাট অংশে অবরুদ্ধ হয়ে পড়বেন ফিলিস্তিনিরা। বিশ্লেষকেরা মনে করেন, ট্রাম্প ইসরায়েলের জন্য যা করে গেছেন তা থেকে বাইডেন খুব একটা সরবেন বলে মনে হয় না। জেরুজালেম থেকে মার্কিন দূতাবাস ফের নিশ্চয় তেলআবিবে ফিরিয়ে নেবেন না তিনি। পশ্চিম তীরের ইসরায়েলের একটা অবৈধ বসতিও নিশ্চয় গুড়িয়ে দেবেন না।

সবশেষে এ কথা বলা যায়, বাইডেন নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যসহ মুসলিম দেশগুলোতে এখন যে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা রয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের ভূরাজনৈতিক স্বার্থেই অনেকটা কেটে যেতে পারে। মুখে যাই বলুন, প্রথাগত ভারসাম্য রক্ষার নীতি থেকে সরে যাবেন না বাইডেন। উপসাগরীয় অঞ্চলেও প্রভাব হারাতে চাইবেন না। সিরিয়া-ইরাক-আফগানিস্তান থেকেও একেবারে সরবেন না। তবে ইয়েমেন যুদ্ধ অবসানে অগ্রগতি হতে পারে। কিন্তু ফিলিস্তিন কতটা লাভবান হতে পারবে তা একেবারেই অনিশ্চিত।

আজারবাইজান-আর্মেনিয়ার কারাবাখ চুক্তি : তুরস্কের ভূমিকা ও অর্জন

পরওয়ানা ডেস্ক:

কয়েক সপ্তাহব্যাপী চলমান আজারবাইজান-আর্মেনিয়া যুদ্ধ বিরতির জন্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরে গত নভেম্বরে স্বাক্ষরিত তুরস্ক ব্যাপক অভিনন্দন অর্জন করেছে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে, জনগণের নিকট ও গণমাধ্যমে, সর্বত্র একই রকম প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। আর্মেনিয়া, আজারবাইজান ও রাশিয়ার মধ্যে নাগরনো কারাবাখ অঞ্চলের যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য এ চুক্তি সাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী আজারবাইজান তাদের দখলিকৃত ভূমি ফিরে পায়, যুদ্ধক্ষেত্রে রুশ শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েন করা হয়, এসব হয়েছে আজারবাইজান বাহিনীর অদম্য গতি ও আর্মেনিয়ার রাজধানীর নিকটবর্তী হয়ে যাওয়ার পর। তুরস্কের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসমূহে যখন এ চুক্তিকে আজারবাইজানের বিজয় এবং কয়েক দশক ধরে অবৈধভাবে আর্মেনিয়ার দখলে থাকা তাদের ভূমির পুনরুদ্ধার হিসেবে দেখা হচ্ছে, তখন অনেক অ্যাক্টিভিস্ট এ চুক্তিটিকে আঙ্কারার বিজয় হিসেবে বিবেচনা করছেন। তারা আঙ্কারাকে এ যুদ্ধের মৌলিক অংশীদার হিসেবেও দেখছেন। কিন্তু শুধুমাত্র চুক্তিতে শুধুমাত্র রুশ শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েনের শর্ত থাকায় এ ক্ষেত্রে তুরস্কের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

বিবাদমান অঞ্চলে তুর্কি বাহিনী

এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায় তুরস্কের ক্ষমতাসীন দল একেপির নেতা ও সাবেক সাংসদ রাসুল তুসুনের কথায়। তিনি আল জাজিরাকে জোর দিয়ে বলেন, চুক্তির রূপরেখা চূড়ান্ত হয়েছে তুর্কি প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান ও রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের পারস্পরিক ঐক্যমতের ভিত্তিতে। চুক্তি সাক্ষরের আগের দিন তারা এ ঐক্যমতে পৌছান। এরপর দুই দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

তুসুন আরো জানান যে, রুশ বাহিনীর পাশাপাশি শান্তিরক্ষায় তুর্কি বাহিনীও অংশগ্রহণ করবে এবং যুদ্ধবিরতি পর্যবেক্ষণকেন্দ্রে রাশিয়ার পাশাপাশি তুর্কি অফিসারগণও থাকবেন।

একেপির এ নেতা আরো বলেন যে, প্রকৃতপক্ষে আজারবাইজানের বিজয় তুরস্কেরই বিজয়, কারণ "আজারবাইজানের সাথে আমাদের সম্পর্ক ভাইয়ের সাথে ভাইয়ের সম্পর্কের অনুরূপ। আর আমরা দুই রাষ্ট্রে একই জাতি বসবাসরত।" তিনি আরো যোগ করেন, "এ চুক্তিতে আমাদের জন্য অতিগুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় রয়েছে। তা হলো আজারবাইজান স্থলভাগ দিয়ে নাখচেভান অঞ্চলের সাথে সংযুক্ত হচ্ছে। এর মধ্য দিয়ে আজারবাইজান তুরস্কের সাথে প্রথম বারের মতো স্থলভাগ দিয়ে সংযুক্ত হলো। এ বিষয়টি হতে না দেওয়ার জন্য কিছু রাষ্ট্র চেষ্টা করছিল। এর মধ্য তুরস্কের ভূরাজনৈতিক বিজয় অর্জিত হয়েছে।"

যোগাযোগের করিডোর

এদিকে তুর্কি রাষ্ট্রপতির দফতরের গণযোগাযোগ বিভাগের একটি সূত্র আল জাজিরাকে জানিয়েছে যে, "আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের মধ্যকার এ চুক্তিটি এবারের দ্বন্দ্ব শুরু হওয়ার পর থেকে তুরস্ক ও রাশিয়ার প্রচেষ্টার ফলে সম্ভব হয়েছে।" সূত্র আরো জানায়, "চুক্তির ধারাসমূহ আজারবাইজান ও তুরস্কের জন্য খুবই যথাযথ। বিশেষত এ চুক্তির ফলে আজারবাইজান সরাসরি তুরস্কের সাথে স্থলভাগ দিয়ে মিলিত হতে পারছে। আর্মেনিয়া কর্তৃক জবরদখলকৃত ভূমি আজারবাইজান ফিরে পাচ্ছে।"

এখন তুরস্কের মূল লক্ষ্য হচ্ছে আজারবাইজানের ভূখণ্ডের নিরাপত্তা ও অখণ্ডতা নিশ্চিত করা। আর্মেনিয়ার পক্ষ থেকে আজারবাইজানের ভূমিতে ভবিষ্যতের যে কোন হুমকি প্রতিরোধ করতে বাকুর সাথে আঙ্কারা নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করবে বলেও সূত্র জানায়। এছাড়াও এ চুক্তির ফলে দক্ষিণ ককেশাসে তুরস্ক প্রভাবশালী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সূত্র অনুসারে এ চুক্তি বাস্তবায়নের অর্থ হচ্ছে তুরস্ক ও আজারবাইজানের মধ্যে অর্থনৈতিক যোগাযোগের চ্যানেল উন্মুক্ত হওয়া, পাশাপাশি উজবেকিস্তান, কাজাখিস্তান, তুর্কমেনিস্তান থেকে শুরু করে ইরানের মধ্য দিয়ে না গিয়েই তাজিকিস্তান, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

নাখচেভান অঞ্চল

এ চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হওয়ার পূর্বে আজারবাইজানের নাখচেভান ছিটমহলে যেতে হতো হয়তো আর্মেনিয়া অথবা ইরানের মধ্য দিয়ে। কিন্তু এ চুক্তির পর নাখচেভান ছিটমহলের পাশাপাশি আজারবাইজানের এখন সরাসরি তুরস্কের সাথেও ভৌগলিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। চুক্তি অনুসারে আজারবাইজান ২৩ কিলোমিটার দীর্ঘ ও ৮ কিলোমিটার প্রশস্ত একটি করিডোর পেয়েছে।

নাখচেভান ছিটমহল আজারবাইজানের অন্তর্ভুক্ত একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল। এটি দক্ষিণ ককেশাস অঞ্চলে আর্মেনিয়া, ইরান ও তুরস্কের মাঝখানে অবস্থিত, এ অঞ্চলের রাজধানীর নামও নাখচেভান। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের সবচেয়ে বিচ্ছিন্ন এলাকা হচ্ছে এই নাখচেভান, এখানে পর্যটকরা খুব কমই গিয়ে থাকেন। এ অঞ্চলে আয়তন প্রায় ৫৩৬৩ বর্গ কিলোমিটার, এটি আজারবাইজানের অন্যান্য অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন। নাখচেভানের জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে চার লাখের মতো। তুর্কি সংবাদ মাধ্যম অনুসারে, তুর্কি ট্যাংক ও স্থলবাহিনী বিশেষ উপায়ে নাখচেভানে পৌছায়।

রেলওয়ে ও সামরিক ঘাটি

বিভিন্ন তুর্কি পত্রিকা বলছে, তুরস্ক, নাখচেভান ও আজারবাইজানের মধ্যকার দূরত্ব সত্ত্বেও এসব অঞ্চলের যোগাযোগ সহজীকরণের জন্য একটি রেললাইন নির্মিত হতে যাচ্ছে। এ পথ দিয়ে বিভিন্ন ধরনের কৌশলগত পণ্য পরিবহন করা সম্ভব হবে।

এদিকে আজারবাইজানের গণমাধ্যম অনুসারে, তুরস্কের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও আজারবাইজানের উচ্চপর্যায়ের সামরিক প্রতিনিধি দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে বাকু ও আঙ্কারার মধ্যে অতিগুরুত্বপূর্ণ কিছু দস্তাবেজ প্রস্তুত করা হয়েছে। উভয় পক্ষ এ বৈঠকে নাখচেভানে তুরস্কের সামরিক ঘাটি নির্মাণের বিষয়েও আলোচনা করেছে।

[নিবন্ধটি আল জাজিরার আরবি সংস্করণে প্রকাশিত এবং মিফতাহ তালহা কর্তৃক অনূদিত]

উজবেকিস্তানে ওলী-আউলিয়ার পাশে

মারজান আহমদ চৌধুরী

অক্টোবর মাসের শেষ দিক। বাংলাদেশে তখনও শীতের আমেজ নেই। কিন্তু নয়াদিল্লী থেকে উজবেক এয়ারের ফ্লাইটে চড়ে তাসখন্দে পা রাখা মাত্র শীতের এক তীব্র ঝাঁপি এসে শরীরে বিঁধল। নীরবে পড়ে থাকা তাসখন্দের ইসলাম করিমভ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর মুসাফিরদের পদচারণায় হঠাৎ সরব হয়ে উঠল। মালয়েশিয়ার ওয়ার্ল্ড সুফি সেন্টারের তত্ত্বাবধানে নকশবন্দী ট্যুরিজম ফ্যাস্টিভাল নামক একটি যিয়ারতের সফরে যোগ দিতে উজবেকিস্তানে এসেছি আমরা। এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যুক্ত হয়েছেন শ'দুয়েক মানুষ।

মধ্য এশিয়ার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ উজবেকিস্তান। আয়তনে বাংলাদেশের তিনগুণ হলেও জনসংখ্যা টেনেটুনে ৩ কোটির সামান্য বেশি হবে। এই অঞ্চলে ইসলামের আগমন ঘটেছিল বহু আগে। খ্রিষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে কতিপয় সাহাবা এবং মূলত তাবেয়ীদের হাত ধরে ইসলাম এখানে প্রবেশ করেছিল। পরবর্তীতে ইরানের সামানিয়া নামক সুন্নী রাজবংশ এই এলাকায় ইসলাম প্রচারে বড় ভূমিকা পালন করে। সাহাবীদের কাছে 'মা ওয়ারাউন নাহর' বা নদীর ওপাশ নামে পরিচিত তৎকালীন বৃহত্তম খোরাসানের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আজকের উজবেকিস্তান। আমুদরিয়া এবং সারদরিয়া নদীদ্বয়ের অববাহিকায় অবস্থিত এই মধ্য এশিয়া ইসলামী ইতিহাস-ঐতিহ্য, সভ্যতা-সংস্কৃতির এক উজ্জ্বল স্মারক হয়ে আছে। তৎকালীন বৃহত্তর খোরাসান মুসলিম উম্মাহকে উপহার দিয়েছে জগদ্বিখ্যাত সব মুহাদ্দিস, ফুকাহা, মুজাহিদ, আউলিয়া।

গত শতাব্দীর প্রায় ৭৩ বছর কমিউনিস্ট সোভিয়েত ইউনিয়নের অধীনে থাকাকালীন উজবেক মুসলমানরা বাধ্য হয়েই ইসলাম থেকে কিছুটা দূরে সরে গিয়েছিল। সোভিয়েত সরকার জোরপূর্বক মসজিদ, মাদরাসা ও আউলিয়া- মাশায়িখের স্মৃতিবিজড়িত স্থানসমূহকে সরাইখানা এবং সরকারি গোদাম বানিয়ে রেখেছিল। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙ্গার পর উজবেকিস্তান স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তবে এরপরও প্রায় সিকি শতাব্দী সোভিয়েতের ভূত হয়ে উজবেক মুসলমানদের ঘাড়ে চেপে রয়েছিলেন কমিউনিস্ট দর্শনে বিশ্বাসী উজবেকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্ট ইসলাম করিমভ। দীর্ঘ পঁচিশ বছর শ্বাসরুদ্ধকর একনায়কতান্ত্রিক শাসনের পর ২০১৬ সালে তিনি পরলোকগমন করেন। এ দীর্ঘ শাসনামলে ইসলাম করিমভ যেমন ইসলামকে কোণঠাসা করেছেন, তেমনি নিজের নয়নাভিরাম দেশটিকেও ভ্রমণ পিপাসুদের নাগাল থেকে এক প্রকার আড়াল করেই রেখেছিলেন। বর্তমান প্রেসিডেন্ট শাভকাত মির্জায়োয়েভ ক্ষমতায় আসার পর পরিস্থিতিতে বস ফিরতে শুরু করেছে। ভ্রমণের ওপর আরোপিত অযাচিত কড়াকড়ি খানিকটা শিথিল হতে দেখা যাচ্ছে, মসজিদে মুসল্লিদের আগমন বেড়েছে, জংধরা দরজা খুলে ঐতিহ্যবাহী মাদরাসাগুলোতে শিক্ষার্থীদের গুনগুনানি শোনা যাচ্ছে। মুসলিম ঐতিহ্যকে ধারণ করা চোখধাঁধানো সব স্থাপত্যে নতুন রঙ এসেছে, আউলিয়া-মাশায়িখের মাযারে যিয়ারতকারীদের আনাগোনা শুরু হয়েছে।

প্রতি বছর ওয়ার্ল্ড সুফি সেন্টার উজবেকিস্তানে নকশবন্দী ট্যুরিজম ফ্যাস্টিভালের আয়োজন করে থাকে। উদ্দেশ্য, সিলসিলা নকশবন্দিয়্যার আউলিয়া-মাশায়েখ এবং প্রথিতযশা ইমাম-আইম্মার মাযার যিয়ারত। সাথে অন্যান্য দর্শনীয় স্থানও ঘুরে দেখানো হয়। এই ট্যুর উজবেক সরকারের সাথে সমন্বয় করে আয়োজন করা হয় বিধায়

যিয়ারতকারীরা নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন। ২০১৯ সালের এই সফরে আমাদের সাথে ছিলেন ১২টি দেশের প্রায় দুইশ মানুষ।

তাসখন্দ বিমানবন্দরে নেমেই মনে হয়েছিল, এই বিমানবন্দর সচরাচর একসাথে এত মানুষের ভার বহন করতে অভ্যস্ত নয়। দীর্ঘ সময় ধরে ইমিগ্রেশনের কাজ শেষ করে বাইরে এসে দেখলাম আমাদেরকে অভ্যর্থনাকারী দলের সদস্যরা অপেক্ষমাণ। ওয়ার্ল্ড সুফি সেন্টারের নির্বাহী প্রধান শায়েখ আবদুল করিম সাঈদ খাদাইদ আমাদের সাথে পরিচিত হলেন। নির্ধারিত স্থানে কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে আমরা চলে গেলাম তাসখন্দ রেলস্টেশনে। গন্তব্য ঐতিহ্যবাহী শহর বোখারা। মধ্যখানে বলে রাখি, উজবেকিস্তানে টয়লেট-যাত্রা আক্ষরিক অর্থেই এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। তাশখন্দে যে স্থানে আমরা বিশ্রাম নিয়েছিলাম, সেখান থেকে শুরু করে প্রতিটি শহরে, প্রতিটি দর্শনীয় স্থানে, প্রায় প্রতিটি হোটেলে আমরা পানিবিহীন টয়লেটে এক না-বলা যন্ত্রণার শিকার হয়েছি। আমার জন্য বিষয়টি অভূতপূর্ব ছিল না। ইতিপূর্বে থাইল্যান্ড ও মিশরে আমি এ ধরনের টয়লেট দেখেছি। তবে অনেকের জন্য এটি একেবারেই নতুন। ব্যাপারটি হলো, উজবেকিস্তানের টয়লেটগুলোতে পানি থাকে না। সেটি পুরোনো পলেস্তারাহীন পাবলিক টয়লেট হোক কিংবা পাঁচতারা হোটেলের ঝকঝকে টয়লেট। কমোডের সাথে লাগোয়া যে পুশ শাওয়ার ব্যবহার করে আমরা অভ্যস্ত উজবেকিস্তানে সেটি যেন এক অকল্পনীয় সোনার হরিণ! আমি এর ইতিহাস খুঁজেছি, কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো কারণ বের করতে পারিনি। আমার কাছে মনে হয়েছে ব্যাপারটি পবিত্রতা অর্জনের ধারণার সাথে সম্পৃক্ত। আমরা মুসলমানরা যে ধরনের পবিত্রতা অর্জনে অভ্যস্ত অমুসলিমরা সে ধরনের পবিত্রতার ধারণায় অভ্যস্ত নয়। যেহেতু উজবেকিস্তান দীর্ঘ এক শতাব্দী সোভিয়েত কমিউনিস্ট শাসনের অধীন ছিল, একইভাবে মিশর ছিল ব্রিটেন-ফ্রান্সের কলোনি তাই তাঁদের মনমানসিকতার মধ্যে শাসকগোষ্ঠীর অভ্যাসের ছিটেফোঁটা আজও বাকি রয়ে গেছে। উজবেকরা টিস্যু দিয়ে ইস্তিঞ্জার কাজ সারলেই যথেষ্ট মনে করে। কিন্তু আমাদের মতো ভাতে অভ্যস্ত বাঙালিদের জন্য এ ব্যাপারটি একেবারে অসম্ভব। শুনতেই গা শিরশির করে। তাছাড়া উজবেকিস্তানে টয়লেট ব্যবহার করতে টাকা দেওয়া লাগে। সেটি না হয় দিলাম, কিন্তু টয়লেটে পুশ শাওয়ার রাখবে না, বেসিন রাখবে না, পানির পাত্র রাখবে না, এটি কী করে মানা যায়? আমরা দায়িত্বশীলদেরকে বললাম, টয়লেটে পানি নেই। তাঁরা অবাক হয়ে প্রশ্নটি ফিরিয়ে দিলো, 'টয়লেটে পানি দিয়ে কী করবে?' উপায়ন্তর না দেখে আমরা পানির বোতল নিয়ে টয়লেটে যাওয়ার অভ্যাস করে নিলাম। উজবেকিস্তানে থাকাকালীন পানি খাওয়ার পর আমরা সযত্নে বোতলটি রেখে দিতাম। কারণ পরেরবার প্রকৃতির ডাকে এই বোতলই আমার অন্ধের যষ্টি।

উজবেকিস্তানের রেলওয়ে আমাদের চেয়ে অনেক উন্নত। তবে পুরো দেশটি যেন খাঁ খাঁ করছে। রেলস্টেশনে ভিড় নেই বললেই চলে। ট্রেনেও নেই আমাদের মতো ধাক্কাধাক্কি। যাত্রাপথে বিস্তীর্ণ মরু-হাওর এলাকা জনশূন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। মাঝে মাঝে তুলার (cotton) ক্ষেত চোখে পড়ে। পাশে সাদামাটা কিছু ঘর-বাড়ি। মাঝেমধ্যে একজন ঘোড়সওয়ারকে দেখা যায় মঙ্গোলিয়ান তেজি ঘোড়া ছুটিয়ে চলছে। ট্রেনযাত্রায় আর তেমন কিছু চোখে না পড়লেও ট্রেনে চড়া উজবেক মানুষদের সাথে পরিচিতিটা বেশ ভালোই হয়েছিল। বিনয়ী, বন্ধুবৎসল, পরিশ্রমী উজবেকরা দেখা হলেই মন খুলে হাসি দেয়। লম্বা সালাম দিয়ে হাত বাড়ায়। এক শতাব্দীর বজ্রকঠিন শোষণ এদের কাছ থেকে অনেক সম্ভাবনা কেড়ে নিলেও এদের বিনয় ও মনুষ্যত্ববোধ বিন্দুমাত্র কেড়ে নিতে পারেনি।

দুপুরের দিকে আমরা এসে পৌঁছলাম বোখারায়। বোখারা নামটিতেই কি জানি এক রহস্য লুকিয়ে আছে! একসময়ের বিশ্বখ্যাত বাণিজ্যিক পথ সিল্করোডের একেবারে মধ্যখানে অবস্থিত ছিল বোখারা। হাজারো বণিক পণ্যের বোঝা চাপিয়ে এই বোখারায় আসত। লাখো বণিক পণ্যের ঢের নিয়ে বেরিয়ে পড়ত দুনিয়ার আনাচে-কানাচে। বিশ্ব অর্থনীতিতে বোখারা শহরের নামটি সোনার হরফে খোদিত আছে। কেবল ব্যবসা-বাণিজ্যই নয়; জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্ম-দর্শন, কৃষ্টি-কালচারে এই শহরটি মানব সভ্যতাকে যা দিয়েছে, পৃথিবীর খুব কম শহরই তা দিতে পেরেছে। মুসলমানদের গৌরবোজ্জ্বল সময়ে বাগদাদের পর বোখারাই ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা-সংস্কৃতির মূল কেন্দ্রবিন্দু। আধুনিক উজবেকিস্তানও মুগ্ধতার উপাদানে ঠাসা। শহরগুলোকে সাজাতে উজবেকরা রুচির পরিচয় দিয়েছে। ঝকঝকে রাস্তা-ঘাট, দুইপাশে নানাপদের গাছ-গাছালি, উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা, স্থাপত্যে সূক্ষ্ম জ্যামিতিক মারপ্যাঁচের সাথে ইসলামী প্রকৌশল সংস্কৃতির মিশ্রণ- উজবেকিস্তান যেন শিল্পীর তুলিতে আঁকা।

আমরা নির্ধারিত রেস্টুরেন্টে দুপুরের খাবার সারলাম। বুফে পদ্ধতির খাবার, তাই প্রচুর আয়োজন। তবে খাবারগুলো লবণ-মরিচাবিহীন, খেতে আলুনি আলুনি লাগে। দেখে মনে হয়, তেলের প্রাচুর্য দিয়ে লবণ-মরিচের অপ্রতুলতাকে শোধবোধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। খাওয়ার পর ট্যুরিজম ফ্যাস্টিভালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হলো। অনেক আলিম-উলামার সাথে সৌজন্য সাক্ষাত হলো। পাকিস্তানের নকশবন্দিয়্যা সিলসিলার বুযুর্গ জনাব জুলফিকার আহমদ নকশবন্দীর দুআর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হলো।

প্রথমদিনের কর্মসূচির অংশ হিসেবে আমরা সায়্যিদ শামসুদ্দীন আমির কুলাল (র.) এর মাযার যিয়ারতে গেলাম। সায়্যিদ আমির কুলাল তাসাউফের সোনালি ধারার এক খ্যাতিমান বুযুর্গ এবং সিলসিলা নকশবন্দিয়্যার প্রবর্তক ইমাম বাহাউদ্দীন নকশবন্দ বুখারী (র.) এর মুর্শিদ। একইসাথে তিনি মধ্য এশিয়ার জাতীয় বীর আমির তৈমুর লংয়ের মুর্শিদ। যৌবনে আমির কুলাল একজন কুস্তিগির, গোত্রপতি ও খ্যাতিমান আলিমে দীন হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি মুহাম্মদ বাবা সাম্মাসী (র.) এর কাছে তাসাউফের সবক গ্রহণ করেন। সায়্যিদ আমির কুলালের মাযারে প্রথমবার আমরা 'উজবেক-সন্ধ্যা' প্রত্যক্ষ করেছিলাম। সময় নিয়ে সন্ধ্যা নামে, আমাদের মতো ধুম করে নয়। পড়ন্ত বিকেলের মৃদু আলো ম্লান করে ধীর পায়ে শান্তসন্ধ্যার আগমনী দৃশ্য, তার ভেতরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা মাযার কমপ্লেক্সের নীলাভ গম্বুজ এক নৈসর্গিক সৌন্দর্যের জন্ম দিয়েছিল। আমরা অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম।

আমাদের সফরের মূল প্রতিপাদ্য ছিল তাসাউফের সুপ্রসিদ্ধ সিলসিলা নকশবন্দিয়্যার প্রতিষ্ঠাতা ইমাম সায়্যিদ বাহাউদ্দীন নকশবন্দ বুখারী (র.) এর কবর যিয়ারত ও ঈসালে সাওয়াব মাহফিল। রাতে আমরা চলে গেলাম বোখারা মূল শহর থেকে ১৬ কিলোমিটার দূরে

কাসরে আরিফান নামক গ্রামে, যেখানে শুয়ে আছেন আল্লাহর এ মহান ওলী। ১৩১৮ সালে এই গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, ১৩৮৯ সালে এখানেই তাঁর ইন্তেকাল হয়েছিল। যুবক বয়সেই তিনি মধ্য এশিয়ার এক মান্যবর আলিমে দ্বীন হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। হজ্জের উদ্দেশ্যে তিনবার মক্কা-মদীনা সফর করেছেন। বাহাউদ্দীন নকশবন্দ (র.) তৎকালীন মধ্য এশিয়ার প্রখ্যাত বুযুর্গ সায়্যিদ শামসুদ্দীন আমির কুলাল (র.) এর কাছ থেকে তাসাউফের দীক্ষা লাভ করেন। তিনি পূর্বসূরি বুযুর্গদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তাসাউফের সোনালি ধারাকে অধিকতর সহজ করে সালিকদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। ইমাম বাহাউদ্দীন নকশবন্দ (র.) বলেছেন, 'আমাদের তরীকার সুদৃঢ় হাতল হচ্ছে সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা এবং সাহাবীদের পথ অনুসরণ করা।' নকশবন্দিয়্যা-মুজাদ্দেদিয়া সিলসিলার শাজরাহ অনুযায়ী ইমাম বাহাউদ্দীন নকশবন্দ বুখারী (র.) রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ১৬তম অধস্তন পুরুষ।

পরদিন সকালে আমরা গেলাম গুযদোয়ান। সেখানে ইমাম আবদুল খালিক গুযদোয়ানী (র.) এর কবর যিয়ারত করলাম। ইমাম বাহাউদ্দীন নকশবন্দ (র.) কর্তৃক সিলসিলা নকশবন্দিয়্যা প্রবর্তনের পূর্বে তাসাউফের এই সোনালি ধারা সিলসিলা-ই-খাজেগান নামে প্রসিদ্ধ ছিল। এই সিলসিলা-ই-খাজেগানের সূচনা হয়েছিল আবদুল খালিক গুযদোয়ানীর হাতে। পরবর্তীতে সিলসিলা নকশবন্দিয়্যার যে ১১টি মূলনীতি প্রণীত হয়েছিল, তার মূল কৃতিত্ব আবদুল খালিক গুযদোয়ানীর। সিলসিলা নকশবন্দিয়্যার ১১টি মূলনীতি হলো- হুশ দর দাম (শ্বাসপ্রশ্বাসে সচেতনতা), নযর বর কদম (চলাফেরায় দৃষ্টি অবনত রাখা), সফর দর ওয়াত্বান (অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ), খালওয়াত দর আঞ্জুমান (ভিড়ের মাঝে একাকীত্ব), ইয়াদ কার্দ (স্মরণ), বায গাশত (প্রত্যাবর্তন), নিগাহ দাশত (মনোযোগ), ইয়াদ দাশত (ধ্যান), উকুফে যামানী (সময় সচেতনতা), উকুফে আদাদী (সংখ্যার সচেতনতা) এবং উকুফে ক্বালবী (হৃদয়ের সচেতনতা)।

আরও কিছুদূর পরে আবদুল খালিক গুযদোয়ানীর খলিফা খাজা আরিফ রেওগারভী (র.) এর কবর। সেখানেও যিয়ারত করলাম। খাজা আরিফ (র.) এর লিখিত তাসাউফের কিতাব 'আরিফনামা' আজও পাকিস্তানের একটি সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত আছে। এরপর চলে গেলাম আফসোনা। এই আফসোনা গ্রামে ৯৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বিশ্ববিখ্যাত চিকিৎসক ও দার্শনিক আবূ আলী ইবনে সিনা। এরিস্টটলের দর্শন এবং মৌলিক চিকিৎসাবিদ্যায় ইবনে সিনার অবদান চিরস্মরণীয়। তাঁর লেখা 'আল কানুন ফিত-ত্বিব' গ্রন্থটি বহু শতাব্দী এশিয়া ও ইউরোপে চিকিৎসাবিদ্যার মূলপাঠ হিসেবে পঠিত হতো। তাঁর আবাসস্থল ঘুরে দেখলাম। এরপর গেলাম ফারগানা। সেখানে আমরা খাজা আরিফ রেওগারভীর খলিফা খাজা মাহমুদ আনজির ফাগনাভী (র.) এর কবর যিয়ারত করলাম। খাজা মাহমুদ আনজির কেবল একজন সূফি সাধকই নন; বরং তিনি একজন ইসলামী দার্শনিকও ছিলেন। ইসলামী শরীআতের বাস্তবায়ন ও খিলাফত প্রতিষ্ঠার চিন্তায় তিনি বহুদূর এগিয়ে গিয়েছিলেন। এভাবে আউলিয়া-আল্লাহর যিয়ারতে দিনটি কেটে গেল। পথিমধ্যে বিভিন্ন মসজিদে নামাজ আদায় করে নির্ধারিত জায়গায় খাবার সারলাম। তবে দিনশেষে আমাদের জন্য বড় চমক হয়ে থাকল আফসোনায় অবস্থিত ইবনে সিনা জাদুঘর। বহুবিদ্যাজ্ঞ (Polymath) আলবিরুনীর নিজ হাতে আঁকা পৃথিবীর প্রথম মানচিত্র, সৌরজগতের হিসেব-নিকেশ, গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান সম্বন্ধে তাঁর গাণিতিক প্রস্তুত প্রণালি আমাদেরকে মুগ্ধ করেছিল। গর্ব হচ্ছিল, যে যুগে ইউরোপের রাস্তায় বাতি জ্বলত না, সে যুগে মুসলিম বিজ্ঞানীরা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পরিধি মেপেছিলেন।

চলবে...

রঙ প্রিন্টার্স
একটি নতুন সৃষ্টির চিন্তাধারা

আমাদের সেবাসমূহ

- ম্যাগাজিন
- ভাউচার
- আইডি কার্ড
- ব্যানার
- ক্যালেন্ডার
- খাম
- প্যাড
- ফ্যাস্টুন
- পোস্টার
- চালান বই
- স্টিকার
- গেঞ্জি প্রিন্ট
- লিফলেট
- আমন্ত্রণ কার্ড
- চাঁদা রশিদ
- মগ প্রিন্ট
- ক্যাশ মেমো
- ভিজিটিং কার্ড
- লেভেল
- যাবতীয় ছাপা কাজ।

পিয়ার মাহমুদ
স্বত্বাধিকারী
মোবা: ০১৭১৮ ৩৩৬৮৫৫

আহসান মাহমুদ
পরিচালক
মোবা: ০১৭৪২ ৬২৭৮৭৯

হোসেন মাহমুদ
পরিচালক
মোবা: ০১৭৬৫ ৩৬১৯৬২

৩১৭, রংমহল টাওয়ার (৩য় তলা), বন্দর বাজার, সিলেট।
E-mail: rangprinter@gmail.com

রাহবার লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী

প্রোঃ মোঃ আজাদ হোসেন
মোবা : ০১৭৫৭-২৬৬২৮১
০১৮৩০-৬৩৪৬৪৯

এখানে মাদরাসা ও কিন্ডারগার্টেনের বই, খাতা-কলম, পেন্সিল, ইসলামিক বই, ম্যাগাজিন, উপন্যাস, আতর, টুপি ইত্যাদি যাবতীয় সুন্নাহ সামগ্রী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল (এম.এ) মাদরাসা সংলগ্ন
সোবহানীঘাট, সিলেট।

আয়া সোফিয়ার ইতিহাস ও সতেজ অনুভূতি

মাহফুজ আল মাদানী

খবর শুনলাম খুব শীঘ্রই আয়া সোফিয়াকে আবার নামাজের স্থান হিসেবে ঘোষণা করা হচ্ছে। তখন থেকেই প্রতীক্ষার প্রহর গুণতে লাগলাম। মনে মনে ভাবছিলাম যেদিন রায় ঘোষিত হবে সেদিন সম্ভবত মসজিদে নামাজ আদায় হবে। যেভাবেই হোক সেখানে উপস্থিত হয়ে নামাজ আদায় করব। সেজন্য প্রস্তুতি নিয়েই রেখেছিলাম। অবশেষে ১০ই জুলাই ২০২০ ইং শুক্রবার রায় ঘোষণা হয়। কল্পনাই করতে পারিনি যে, এত আয়োজন করে আয়া সোফিয়া মসজিদ হিসেবে ফিরে আসবে। সেদিন রীতিমত জায়নামাজ নিয়ে আয়া সোফিয়াতে উপস্থিত হই। আয়া সোফিয়াতে পৌঁছে দেখি নামাজের মতো কোন ব্যবস্থা তখনও হয়নি। রায় ঘোষণা হলেও জুমআর আগে রায় প্রকাশিত হয়নি। তাই আয়া সোফিয়ার পাশেই বিখ্যাত ব্লু মস্ক বা সুলতান আহমেদ মসজিদে জুমআর নামাজ আদায় করি। নামাজ আদায় শেষে আয়া সোফিয়ায় প্রবেশ করি। তখনও আয়া সোফিয়াতে প্রবেশ করতে প্রবেশ ফি বাধ্যতামূলক ছিল। আমার কাছে একবছরের মিউজিয়াম কার্ড থাকায় অনায়াসে প্রবেশ করতে পারি। আয়া সোফিয়াতে প্রবেশ করে চতুর্দিক ঘুরে ঘুরে ভালো করে অবলোকন করতে থাকি। কল্পনায় ভাবতে থাকি, আয়া সোফিয়া ইনশাআল্লাহ! খুব শীঘ্রই আমরা তোমাকে তোমার মূল স্থানে ফিরে পাব। তোমাতে মহান রবের তরে মাথা নত করে আমরা ফিরে পাব ইস্তাম্বুল বিজেতা মহাবীর সুলতান মুহাম্মদ ফাতিহ (র.) এর রেখে যাওয়া আমানত। ঐদিন বিকেলে আসরের পরপরই রায় ঘোষিত হয় আয়া সোফিয়া আবারও মসজিদ হিসেবে নামাজের জন্য খুলে দেওয়া হবে। এটাও বলা হয় যে, আগামী ২৪ শে জুলাই শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে জুমআর নামাজ আদায়ের মাধ্যমে উদ্বোধন করা হবে। এসময়ের মধ্যে আয়া সোফিয়াকে নামাজের জন্য প্রস্তুত করা হবে। যেহেতু এটা মিউজিয়াম ছিল তাই নামাজের পরিবেশ ছিল না। সেদিন থেকেই প্রতিনিয়ত সর্বশেষ সংবাদ রাখতে থাকি। শুরু হয় ক্ষণগণনা।

আয়া সোফিয়া বা ইম্পেরিয়াল মস্ক। যার রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাস।

মুসলমান এবং খ্রিস্টান উভয় ধর্মালম্বীদের পবিত্র স্থান। দৃষ্টিনন্দন স্থাপনাটি ঐতিহ্যের স্বাক্ষর বহন করছে। ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায়ও রয়েছে শীর্ষে। ভ্রমণ পিপাসুদের কাছে স্থানটি বেশ আকর্ষণীয়। ২০১৪ সালে এটি ছিল তুরস্কের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দর্শনীয় স্থান। উপাসনালয়টি আমাদের প্রিয় নবী ইমামুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পৃথিবীতে শুভাগমনেরও আগে নির্মিত হয়েছিল। বাইজেন্টাইন সময়ে ৫৩২ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট জাস্টিয়ান অর্থোডক্স খ্রিস্টানদের উপাসনালয় হিসেবে বর্তমান ইমারতটি নির্মাণ করেন। ৫ বছর ১০ মাস সময়ে এটি নির্মিত হয়। নির্মাণ কাজ শেষ হয় ৫৩৭ সালে। ১২০৪ সালে সেটা চলে যায় ক্যাথলিক খ্রিষ্টানদের নিয়ন্ত্রণে। ১২৬১ সালে অর্থোডক্স খ্রিষ্টানরা এটি পুনরুদ্ধার করে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন। বিজয়ী দলের প্রশংসাও করেছিলেন। তাই কনস্টান্টিনোপলকে কেন্দ্র করে প্রচুর অভিযান পরিচালিত হয়। সময়ের ঘূর্ণয়মানে ১৪৫৩ সালে মহাবীর সুলতান মুহাম্মদ ফাতিহ (র.) হাদীসে বর্ণিত কুসতুনতুনিয়া বা কনস্টান্টিনোপলকে জয় লাভ করেন। কোন স্থান বা দেশ জয়ের পর বিজয়ীদের কাছে সেটা স্বাধীনমত ভোগ করার ক্ষমতা স্বভাবসুলভ। যেহেতু এটি খ্রিষ্টানদের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও উপাসনালয় ছিল তাই তিনি সেটাকে ইচ্ছামত ব্যবহার করেননি। সুলতান মুহাম্মদ ফাতিহ (র.) খ্রিষ্টানদের নিকট থেকে নিজের ব্যক্তিগত তহবিল থেকে ক্রয় করে এটিকে মসজিদের জন্য ওয়াকফ করে দেন। নতুন বিজিত কনস্টান্টিনোপলে মুসলমানদের নামাজ আদায়ের জন্য মসজিদ ছিল না। তাই ওয়াকফকৃত আয়া সোফিয়াকে ইম্পেরিয়াল মস্ক নামে মসজিদে রূপান্তরিত করা হয় এবং ১৪৫৩ সালের ১লা জুন জুমুআর নামায আদায়ের মাধ্যমে এটি মসজিদের মর্যাদালাভ করে। খ্রিষ্টানদের উপাসনালয় বিক্রির ক্রমধারা আজও অব্যাহত রয়েছে। যা আমরা আর্মেনিয়া ও ইউরোপসহ বিভিন্ন দেশে দেখতে পাই। এতেই সহজে অনুমেয় খ্রিষ্টানরা উপাসনালয় বিক্রি করেন কিনা? মহাবীর সুলতান মুহাম্মদ ফাতিহ (র.) এর ক্রয়কৃত চুক্তিপত্রটি আজও বর্তমান তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারার 'তার্কিশ ডকুমেন্ট অ্যান্ড আর্ওমেন্ট ডিপার্টমেন্ট' এ সংরক্ষিত রয়েছে। এটা উহ্য প্রশ্নের সহজ সমাধান।

আয়া সোফিয়া প্রায় ৫০০ বছর মসজিদ থাকার পর আধুনিক তুরস্কের প্রথম রাষ্ট্রপতি কামাল আতাতুর্ক পবিত্র এ মসজিদটিকে ১৯৩৫ সালে মন্ত্রিসভার মাধ্যমে জাদুঘরে পরিণত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যা ছিল খ্রিষ্টানদের খুশি করার কৌশল এবং তুরস্ক থেকে ইসলামকে নির্বাসন দেওয়ার অপচেষ্টা। ১৯২৩ সালে উসমানীয় শাসনকে বিলুপ্ত করলেও গণমানুষের চাপে আয়া সোফিয়াকে পরিবর্তন করা কঠিন ছিল। যার ফলে প্রায় এক যুগ পরে সেটিকে জাদুঘরে রূপান্তর করা হয়। যেহেতু মহাবীর সুলতান মুহাম্মদ ফাতিহ এটা নিজের অর্থায়নে ক্রয় করে ওয়াকফের মাধ্যমে মসজিদে রূপান্তর করেছিলেন তাই চাইলেও তা গীর্জায় রূপান্তর করা কামাল আতাতুর্কের জন্য সহজ ছিল না। ফলে সেটাকে মসজিদ এবং গীর্জার মাঝামাঝি অবস্থানে রেখে জাদুঘরে রূপান্তরিত করেন। যদিও বহু মসজিদকে আতাতুর্ক সরকার বিনষ্ট করেছিল। সুলতান রজব তাইয়্যেব এরদোয়ান সরকার প্রধান হওয়ার পর থেকে আয়া সোফিয়াকে মসজিদে ফিরিয়ে আনার স্বপ্নে ছিলেন বিভোর। তবে সেটা খুব সহজ ছিল না। তিনি বুদ্ধিমত্তার সাথে জনমত গঠনের দিকে মনোনিবেশ করেন। যা ব্যাপক সাড়া ফেলে। ২০১৪ সালে আনতালিয়া ইয়ুথ ফোরামের মাধ্যমে 'জায়নামাজ নিয়ে আয়া সোফিয়া চলো' স্লোগানে আপামর জনতার মধ্যে বিপ্লব গড়ে তুলেন। সর্বশেষ জনগণের দাবির প্রেক্ষিতে ১০ জুলাই ২০২০ ইং শুক্রবার আয়া সোফিয়াকে জাদুঘরের মর্যাদা নাকচ করে মসজিদে রূপান্তরের আদেশ দেওয়া হয়। মামলার রায়ে তুরস্কের সর্বোচ্চ আদালত '১৯৩৪ সালে মন্ত্রিসভার যে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মসজিদ থেকে আয়া সোফিয়াকে জাদুঘরে রূপান্তরিত হয়েছিল তা আইন মেনে করা হয়নি' বলে ঘোষণা করেন। সুলতান এরদোয়ানের স্বাক্ষরের পরপরই ঐদিন আসরের আযান সম্প্রচার করা হয়। প্রায় ৮৬ বছর পর ফিরে পাওয়া হয় মসজিদ আয়া সোফিয়া। একই দিন সুলতান এরদোয়ান ২৪ জুলাই ২০২০ ইং শুক্রবার জুমআর নামাজ আদায়ের বিবৃতি প্রদান করেন। যা ছিল তুরস্কসহ মুসলিম বিশ্বের আপামর জনতার আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের দিন। এ যেন বায়তুল মাকদিস পুনরুদ্ধারের বীজ বপনের সূচনা।

২৪শে জুলাই শুক্রবার। আমরা রুমমেট সকলেই বৃহস্পতিবার রাত থেকে প্রস্তুতি নিতে থাকি পরদিন আয়া সোফিয়াতে জুমআর নামাজ আদায়ের জন্য। বাসা থেকে আয়া সোফিয়া পর্যন্ত পৌঁছতে সময় লাগে ঘন্টাখানেক। সকাল নয়টায় রওয়ানা হয়ে সেখানে পৌঁছতে পৌনে এগারোটা বেজে যায়। আগের দিন সন্ধ্যার পর থেকে মসজিদের চারপাশ কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে যায়। মসজিদের আশেপাশে জায়গা না পাওয়ায় আমাদেরকে অনেক দূরে অবস্থান করতে হয়। তবুও আমরা অনেকটা কাছে ছিলাম যেখান থেকে মসজিদ দেখা যাচ্ছিল। ফিরে আসার সময় দেখতে পাই আমাদের পিছনে প্রায় দুই কিলোমিটার জুড়ে ছিল মানুষের সমাগম । যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল। ৮৬ বছর পর নামাজ আদায় এবং নিজে উপস্থিত থেকে নামাজ আদায়ের অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। সেদিন আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে ইস্তাম্বুলসহ তুরস্কের আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হয়েছিল। মানুষের হাতে কালিমা খচিত পতাকা ও কপালে কালেমা খচিত ব্যাজ এক অনন্য পরিবেশ ধারণ করেছিল। সকাল থেকে মসজিদে পবিত্র কুরআনের সূরা মারইয়াম, সূরা আল ফাতাহ, সূরা কাহাফ, সূরা ইয়াসিনসহ বিভিন্ন সূরা তেলাওয়াত করা হচ্ছিল। নামাজে সুলতান এরদোয়ানসহ মন্ত্রিপরিষদের অনেকেই অংশ নেন। অংশ নেন লক্ষাধিক মুসলিম জনতা। করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব জনসমাগম ঠেকাতে পারেনি। কোভিড-১৯ না থাকলে জনসমাগম কয়েক লক্ষ পেরিয়ে যেত। খুতবার আগে সুলতান এরদোয়ান পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন। ধর্মমন্ত্রী নামাযের খুতবা পাঠ ও ইমামতি করেন। হাতে তরবারি নিয়ে খুতবা প্রদানের মাধ্যমে জানান দেন মুসলিম জাতি বীরের জাতি। আল্লাহ ছাড়া কারো রক্ত চক্ষুকে ভয় করে না। খুতবার এই ভিডিও এবং ছবি পশ্চিমা বিশ্বে কাঁপন ধরিয়ে দেয়। এটা ছিল আধুনিক তুরস্কের আতাতুর্কের কালো অধ্যায় থেকে ইসলামের দিকে এগিয়ে যাওয়ার অন্যতম সোঁপান। যা বিশ্ব সমাজে আবারও তুরস্কে উসমানীয় শাসনের জানান দিতে সক্ষম হয়েছে।

LATIFI HANDS
CHARITY WITH CLARITY

LATIFI HANDS

FULTALI SAHEB BARI, ZAKIGANJ, SYLHET, BANGLADESH

OUR PROJECTS
- EDUCATION
- ORPHANS
- HOUSING PROJECTS
- MASJID PROJECTS
- INFRASTRUCTURE
- SUSTAINABLE LIVELIHOODS
- WEEDING SUPPORT
- SADAQAH PROJECT
- AGRICULTURE SUPPORT
- HEALTH CARE
- EYE CARE
- GIFT

OUR PROJECTS
- QURBANI PROJECT
- EMERGENCY AND DISASTER RELIEF
- BLIND AND DISABLED PROJECT
- WATER PROJECT
- WIDOW SUPPORT

www.youtube.com/latifihands
www.facebook.com/latifihands
www.latifihands.org.uk

খাতুন

খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতিমা (রা.)

মাওলানা জিয়াউল হক চৌধুরী

আল্লামা ইকবাল বলেন, হযরত মারইয়াম আলাইহাস সালাম কেবল একদিক থেকে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের আম্মাজান হওয়ার কারণে জগতবাসীর নিকট সম্মানিত আর হযরত ফাতিমা (রা.) তিনদিকে সম্বন্ধযুক্ত হওয়ার কারণে সম্মানিত। প্রথমত, তিনি রাহমাতুল্লিল আলামীন হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নয়নমণি। দ্বিতীয়ত, 'হাল আতা আলাল ইনসানি হিনুম মিনাদ দাহ্‌র' (কুরআনের এ আয়াত) যার শানে অবতীর্ণ হয়েছে, তিনি সেই হযরত আলী (রা.) এর পবিত্রতম স্ত্রী। তৃতীয়ত, ইশক-মহব্বতের মধ্যমণি ইমাম হাসান (রা.) ও ইশক-মহব্বতের সেনাপতি হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) এর আম্মাজান। (রুমূযে বেখূদী, কুল্লিয়্যাতে ইকবাল)

অধিকতর বিশুদ্ধ অভিমত অনুযায়ী হযরত ফাতিমা (রা.) নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একচল্লিশতম বছরে জন্মগ্রহণ করেন। فاطمة শব্দটি فطم থেকে নির্গত, অর্থ হলো পৃথককারিণী। হযরত আলী (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ফাতিমাকে কেন এ নামে নামকরণ করা হয়েছে? তিনি বলেন, কেননা আল্লাহ তাআলা তাকে এবং তাঁর মহব্বতকারীদেরকে জাহান্নাম থেকে পৃথক করেছেন। (হায়তামী, আসসাওয়াইকুল মুহরিকাহ)

তাঁর উপাধিগুলোর মধ্যে প্রধানত হলো- ১. যাহরা বা ফুলের কলি। কেননা তিনি বেহেশতের ফুলের কলি। ২. বাতুল বা পৃথক। কেননা তিনি তাঁর সময়ের অন্যান্য মহিলাদের চেয়ে জ্ঞান, বংশ মর্যাদা, চরিত্র মাধুর্য ও পরহেযগারী বা খোদাভীতিতে সবার শীর্ষে উঠে পৃথক হয়ে গিয়েছিলেন। ৩. তাহিরা বা পূতপবিত্রা। কেননা তিনি চরিত্র ইয্যত আবরূ ও সম্মানহানী হয় এমন যাবতীয় কর্মকাণ্ড থেকে সম্পূর্ণ পূতপবিত্রা ছিলেন। তাছাড়া আয়াতে তাতহীর إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا এর মধ্যে যে সকল ব্যক্তিগণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন তার মধ্যে তিনিও গণ্য রয়েছেন বিধায় তাকে তাহিরা বলা হয়। ৪. যাকিয়্যা: তিনি হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরানী কন্যা হওয়ার কারণে নবুওয়াতের কল্যাণে আত্মিক দিক থেকে পবিত্রতা লাভ করেছিলেন। তাই তাঁকে যাকিয়্যা বলা হয়।

হযরত ফাতিমা (রা.) দৈহিক গঠনাকৃতির দিক থেকে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা (রা.) ইরশাদ করেন, দৈহিক গঠন, চাল-চলন, উঠা-বসায় হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ হযরত ফাতিমা (রা.) এর চেয়ে আর কাউকে দেখিনি। তিনি বলেন, যখন তিনি নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্যে প্রবেশ করতেন তখন তিনি (নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর (ফাতিমা (রা.) এর) উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়াতেন, তাঁকে চুম্বন করতেন এবং নিজ আসনে তাঁকে বসাতেন। আর যখন নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিকট প্রবেশ করতেন, তখন তিনি নিজ আসন থেকে দাঁড়িয়ে যেতেন, তাঁকে চুম্বন করতেন এবং নিজ আসনে তাঁকে বসাতেন। যখন নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তখন ফাতিমা (রা.) তাঁর নিকট প্রবেশ করে তাঁর দিকে ঝুঁকে গেলেন এবং চুম্বন করলেন অতঃপর মাথা উচু করে কাঁদলেন। অতঃপর তিনি আবার তাঁর উদ্দেশ্যে ঝুঁকে পড়লেন অতঃপর মাথা উচু করলেন এবং হাসলেন। আমি (আয়িশা) বললাম, আমি অবশ্যই ধারণা রাখি যে, তিনি আমাদের নারীদের মাঝে সবচেয়ে বুদ্ধিমতী নারী। কিন্তু (তাঁর হাসি দেখে মনে হলো) অন্যান্য নারীদের মতো তিনিও একজন নারী। যখন নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করলেন, আমি (আয়িশা) তাঁকে (ফাতিমা) বললাম, আপনি আমাকে এর রহস্য বলবেন কি যে, যখন আপনি নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে ঝুঁকে যাওয়ার পর মাথা উত্তোলন করলেন, তখন কেঁদেছিলেন; এবং আবার যখন তাঁর দিকে ঝুঁকে যাওয়ার পর মাথা উত্তোলন করেছিলেন তখন হেসেছিলেন। হযরত ফাতিমা (রা.) বলেন, তাঁর জীবদ্দশায় আমি বিষয়টি গোপন রেখেছি। (কেননা তিনি গোপন বিষয় প্রকাশ করে দেওয়া পছন্দ করতেন না।) তিনি আমাকে বলেছিলেন, এ অসুস্থ অবস্থাতেই তিনি ইন্তিকাল করবেন, তাই আমি কেঁদেছি। অতঃপর তিনি আমাকে বলেছিলেন, তাঁর ইন্তিকালের পর তার পরিবারের লোকদের মধ্যে সর্বপ্রথম আমিই তাঁর সাথে মিলিত হব, এ জন্য আমি হেসেছি। (তিরমিযী)

হযরত ফাতিমা (রা.) কে হযরত আলী (রা.) বিবাহ করেন দ্বিতীয় হিজরী সনের রামাদান মাসে। তখন তাঁর বয়স ছিল ১৫ বছর ৫ মাস অথবা ১৫ বছর সাড়ে ৬ মাস এবং তিনি আলী (রা.) এর গৃহে গমন করেন যিলহজ্জ মাসে। কেউ কেউ বলেন বিবাহ সংঘটিত হয়েছিল রজব মাসে, কেউ বলেছেন সফর মাসে। তখন হযরত আলী (রা.) এর বয়স ছিল ২১ বছর পাঁচ মাস। হযরত ফাতিমা (রা.) যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন হযরত আলী (রা.) আর কোনো নারীকে বিবাহ করেননি। (মুহাম্মদ আহমদ ঈসা, বানাতুর রাসূল)

মুসাদ্দাদ এক ব্যক্তির নিকট থেকে বর্ণনা করেন, তিনি কুফায় হযরত আলী (রা.) এর নিকট থেকে শুনেছেন, হযরত আলী (রা.) বলেন, আমি হযরত ফাতিমাকে বিবাহের প্রস্তাব দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলাম। তখন আমার মনে হলো যে, আমার কিছু নেই। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমার সম্পর্ক ও আত্মীয়তার বন্ধনের কথা মনে করে ফাতিমাকে বিবাহের প্রস্তাব পেশ করলাম। হাকিম, বায়হাকী ও ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কিছু আছে কি? আমি বললাম, না। তখন তিনি আমাকে বললেন, বদর

যুদ্ধের মালে গণিমতের বর্মটি কোথায়? হযরত আলী বলেন, এটি আমার কাছে রয়েছে। তিনি বললেন, এটিই তুমি তাঁকে (ফাতিমাকে) দিয়ে দাও। অতঃপর তিনি বললেন, আমি তোমাদের নিকট না আসা পর্যন্ত কোনো কথা বলবে না। তিনি আমাদের নিকট আসলেন, আমাদের উপর তখন একখানা চাদর ছিল। তিনি আমাদেরকে দেখলেন, তখন আমরা পৃথক হয়ে গেলাম। অতঃপর তিনি একটি (পানির) পাত্র চাইলেন, তা নিয়ে আসা হলো, এবং এতে তিনি দুআ করে দিলেন, অতঃপর তা আমাদের উপর ছিটিয়ে দিলেন। আমি বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের মধ্যে কে আপনার নিকট অধিক প্রিয়? তিনি বললেন, সে (ফাতিমা) আমার নিকট তোমার চেয়ে প্রিয়, তবে তুমি আমার নিকট তাঁর (ফাতিমা) চেয়ে অধিকতর সম্মানিত। (হায়ছামী, মাজমাউয যাওয়াঈদ)

সায়্যিদায়ে কায়িনাত হযরত ফাতিমা (রা.) যখন বিবাহের বয়সে পদার্পণ করেন, তখন সমাজের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে তাঁর জন্য বিবাহের প্রস্তাব আসতে শুরু করে। যাখাইরুল উকবা কিতাবে এসেছে হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বলেন, সর্বপ্রথম হযরত আবূ বকর (রা.) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হযরত ফাতিমা (রা.) এর বিবাহের প্রস্তাব পেশ করেন; রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এখনো আল্লাহর পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে কোন ফায়সালা আসেনি। অতঃপর কুরাইশদের সকল সম্ভ্রান্ত লোকদের মধ্যে হযরত উমার (রা.) সহ অনেকেই বিবাহের প্রস্তাব পেশ করেন। নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে একই উত্তর দেন। অতঃপর কেউ একজন হযরত আলী (রা.)কে হযরত ফাতিমা (রা.) এর উদ্দেশ্যে বিবাহের পয়গাম পেশ করার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, যেখানে কুরাইশ বংশের সম্ভ্রান্ত লোকেরা প্রস্তাব পাঠিয়েছে, সেখানে আমি প্রস্তাব পাঠিয়ে কী লাভ হবে? হযরত আনাস (রা.) বলেন, হযরত আলী (রা.) প্রস্তাব দিলেন এবং প্রতিউত্তরে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হ্যাঁ, এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা আমাকে নির্দেশ প্রদান করেছেন। হযরত আনাস (রা.) বলেন, কয়েকদিন পর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডেকে বললেন, হে আনাস! যাও, আবূ বকর, উমর, উসমান, আব্দুর রহমান বিন আউফ, তালহা, যুবাইর (রা.)সহ অন্যান্য আরো কতিপয় আনসারদের ডেকে নিয়ে এসো। আমি তাদের সবাইকে ডেকে আনলাম। তারা সকলে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একত্রিত হলেন, কিন্তু হযরত আলী (রা.) নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ কোনো প্রয়োজনে এ মজলিসে অনুপস্থিত ছিলেন। নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উদ্দেশ্যে খুতবা পাঠ করলেন। অতঃপর বললেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে হযরত আলীর সাথে আমার কন্যা ফাতিমাকে বিবাহ প্রদানের নির্দেশ প্রদান করেছেন। তোমরা সাক্ষী হও আমি আমার কন্যা ফাতিমাকে চারশ মিসকাল রৌপ্য মোহরানায় আলীর নিকট বিবাহ প্রদান করলাম, যদি আলী এতে রাজি থাকেন। অতঃপর কাঁচা খেজুরের একটি বারকোশ নিয়ে এসে আমাদের সম্মুখে রাখা হলো। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বললেন, তোমরা এ খেজুর কাড়াকাড়ি করে খেতে থাকো, আমরা এ খেজুর কাড়াকাড়ি করেই খেতে থাকলাম। ইতোমধ্যে হযরত আলী (রা.) উপস্থিত হলেন, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন এবং বললেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন আমি যেন ফাতিমাকে তোমার নিকট চারশ মিসকাল রৌপ্যের মোহরানায় বিবাহ প্রদান করি, যদি তুমি এতে রাজি থাকো। হযরত আলী (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ আমি এতে রাজি আছি। অতঃপর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উদ্দেশ্যে দুআ করলেন, 'আল্লাহ তাআলা তোমাদের উভয়ের আঁচলকে একত্রিত করে দিন, তোমাদের উদ্দেশ্যকে ফলপ্রসূ করুন, তোমাদের উভয়ের মাঝে বরকত দান করুন এবং তোমাদের মধ্য থেকে প্রভূত কল্যাণ বের করুন। হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমার নিকট একজন ফেরেশতা আগমন করে বললেন, আল্লাহ তাআলা আপনাকে সালাম পেশ করেছেন এবং বলেছেন, আমি উর্ধ্বজগতের অধিবাসীদের মাঝে আপনার কন্যা ফাতিমাকে আলী বিন আবি তালিবের নিকট বিবাহ প্রদান করেছি। আপনিও পৃথিবীতে ফাতিমাকে আলী বিন আবি তালিবের নিকট বিবাহ প্রদান করুন। (মুহিব্বুদ্দীন তাবারী, যাখায়েরুল উকবাহ)

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা ফাতিমা (রা.) পারিবারিক জীবনে নিজের কাজ নিজে করতেন। নিজে ঘর ঝাড়ু দিতেন, চাক্কি দিয়ে গম পিষতেন, নিজ হাতে রান্না করতেন, মশক ভরে পানি তুলে আনতেন। যার কারণে তাঁর হাত ও শরীর যখম হয়ে যেত। এরপরেও তিনি সর্বদা হযরত আলী (রা.) এর নিকট নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন। কখনো এতে তাঁর নামায, রোযা, কুরআন তিলাওয়াত ও অন্যান্য ইবাদত বন্দেগি ব্যাহত হয়নি।

হযরত ফাতিমা (রা.) নিজে চাক্কি পিষতেন বিধায় তাঁর হাতে কড়া পড়ে যায়। এ কষ্টের কথা তিনি হযরত আলী (রা.) এর নিকট বললে হযরত আলী (রা.) একজন খাদেমের জন্য তাকে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রেরণ করেন। হযরত ফাতিমা (রা.) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে গিয়ে খাদেমের কথা না বলেই ফিরে আসেন। ঘরে ফিরে এসে তারা একত্রে একটি চাদরে আচ্ছাদিত হয়ে শুয়ে পড়েন। চাদরটি এত ছোট ছিল যে, যদি এটি লম্বালম্বীভাবে দিতেন তবে পিঠ বের হয়ে যেত আর যদি আড়াআড়িভাবে দিতেন তবে পা বের হয়ে যেত। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতিমার আগমনের সংবাদ পেয়ে তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আম্মাজান! তুমি আমার কাছে গিয়ে আবার ফিরে চলে এসেছ। আমার কাছে তোমার কোনো প্রয়োজন আছে কি? তিনি বললেন; না, আপনার নিকট আমার কোন প্রয়োজন নেই। তখন হযরত আলী (রা.) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, ফাতিমা চাক্কি পিষতে পিষতে তাঁর হাতে কড়া পড়ে যায়। এজন্য আমি তাকে আপনার নিকট একজন খাদেমের জন্য প্রেরণ করেছিলাম। (মুহিব্বুদ্দীন তাবারী, যাখায়েরুল উকবাহ)

এখানে উল্লেখ্য যে, এ বর্ণনাটিতে পরিলক্ষিত হয় যে, হযরত ফাতিমা (রা.) নিজ থেকে খাদিমের জন্য রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গমন করেননি; বরং তিনি হযরত আলী (রা.) এর নির্দেশ পালন করার জন্যই গিয়েছিলেন। তবুও তিনি গিয়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট খাদিম চাননি, ভয় ও লজ্জায় ফিরে এসেছেন।

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁকে সরাসরি কোনো খাদিম না দিয়ে একখানা আমল বলে দিলেন যে, তোমরা যখন বিছানায় যাবে তখন ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার

আল-হামদুলিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পাঠ করবে। এ তাসবীহগুলো তোমাদের প্রার্থিত খাদিমের চেয়েও উত্তম। অপর বর্ণনায় এসেছে, এ তাসবীহগুলো উচ্চারণে ১০০ বার কিন্তু আমলের পরিমাণে ১০০০ বার। উল্লেখ্য যে, এ তাসবীহকে তাসবীহে ফাতেমী বলা হয়ে থাকে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত ফাতিমা (রা.) যখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট খাদিম চাইলেন তখন তিনি তাদেরকে নিম্নবর্ণিত দুআ শিখিয়ে দিলেন-

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْأَرْضِ، وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ

'হে আল্লাহ! সাত আসমান, সাত যমীন ও মহান আরশের প্রতিপালক, আপনি আমাদের ও সকল কিছুর প্রতিপালক। আপনি বীজ ও দানা সকল কিছুর সৃষ্টিকারী। আপনি তাওরাত, ইনজীল ও কুরআন অবতীর্ণকারী। কপালের চুল ধরে পাকড়াও করেন এমন সকল বস্তু থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আপনিই প্রথম, আপনার পূর্বে কিছুই নেই। আপনিই শেষ, আপনার পরে কিছুই নেই। আপনিই প্রকাশকারী, আপনার উপরে কোন কিছু নেই। আপনিই গোপনকারী আপনার নিচে কোন কিছু নেই। আপনি আমাদের ঋণ পরিশোধ করে দিন এবং আমাদের দারিদ্র থেকে অমুখাপেক্ষী করুন।' (মুহিব্বুদ্দীন তাবারী, যাখায়েরুল উকবাহ)

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন হযরত ফাতিমা (রা.)কে সম্বোধন করে বলেন, আল্লাহ তাআলা তোমার অসন্তুষ্টিতে অসন্তুষ্ট এবং তোমার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট। (মুজাম, তাবরানী)

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হিশাম বিন মুগিরার ছেলেরা আমার কাছে তাদের কন্যাকে আলীর নিকট বিবাহ প্রদানের অনুমতি চেয়েছে। আমি তাদেরকে অনুমতি দিব না, আমি তাদেরকে অনুমতি দিব না, আমি তাদেরকে অনুমতি দিব না। তবে যদি আলী আমার কন্যাকে তালাক দিয়ে বিবাহ করতে চায় তবে সেটি ভিন্ন বিষয়। কারণ আমার কন্যা আমারই অংশ। যা তার সম্মানহানি করে, তা আমারও সম্মানহানি করে। যা তাকে কষ্ট দেয়, তা আমাকেও কষ্ট দেয়। (সহীহ মুসলিম)

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন সফরে বের হতেন, তখন সবশেষে তাঁর সাথে দেখা করে যেতেন এবং সফর থেকে ফিরে এসে সবার আগে তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেন। (আহমাদ)

হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, হযরত আলী (রা.) আবূ জাহেলের মেয়েকে বিবাহের প্রস্তাব দেন। নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনতে পেয়ে হযরত আলী (রা.)কে বলেন, যদি তুমি আবূ জেহেলের কন্যাকে বিবাহ কর, তাহলে আমার কন্যাকে আমার নিকট ফিরিয়ে দাও। কেননা আল্লাহর রাসূলের কন্যা ও আল্লাহর শত্রুর কন্যা এক ব্যক্তির অধীনস্ত হতে পারে না। (মুজামুস সালাসাহ, তাবরানী)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আসমানের একজন ফেরেশতা (ইতিপূর্বে) আমার সাক্ষাত পায়নি। তিনি প্রতিপালকের নিকট আমার সাথে সাক্ষাত করার অনুমতি চাইলেন। আল্লাহ তাকে অনুমতি দিলেন, তিনি আমাকে সুসংবাদ দিলেন যে, নিশ্চয়ই ফাতিমা এ উম্মতের নারীদের সরদার। (মুজাম, তাবরানী)

হযরত আয়িশা সিদ্দিকা (রা.) বলেন, আমি ফাতিমার চেয়ে তাঁর পিতা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত আর কাউকে অধিক সত্যবাদী দেখিনি। হযরত আয়িশা সিদ্দিকা (রা.) বলেন, আমি ফাতিমার চেয়ে তাঁর জন্মদাতা পিতা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত আর কাউকে কখনো অধিক সম্মানিত দেখিনি। (হায়ছামী, মাজমাউয যাওয়াঈদ)

হযরত ফাতিমা (রা.) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের ছয়মাস পর ইন্তিকাল করেন। অপর একটি বর্ণনায় এসেছে এগারো হিজরী সনের তৃতীয় রামাদান মঙ্গলবার রজনীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। হযরত আলী (রা.) তাঁকে রাতেই দাফন করেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর তিন মাস পর্যন্ত তাঁকে হাসতে দেখা যায়নি। হযরত ফাতিমা (রা.) এর ওফাতের সময় যখন ঘনিয়ে আসল, হযরত আলী (রা.)কে পানি আনার জন্য বললেন। তিনি পানি আনলেন, ফাতিমা (রা.) সে পানি দিয়ে গোসল করে পবিত্রতা অবলম্বন করলেন। অতঃপর তিনি কাফনের কাপড় নিয়ে আসার জন্য বললেন। মোটা উলের কাপড় নিয়ে আসা হলো, তিনি তা পরিধান করলেন। অতঃপর হানুত্ব লাগালেন এরপর হযরত আলী (রা.)কে বললেন, তার ইন্তিকালের পর যেন তার সতর আর অনাবৃত করা না হয় বরং তার পরিহিত কাপড়েই যেন সমাহিত করা হয়। (মুহাম্মাদ আহমদ ঈসা, বানাতুর রাসূল)

হযরত আলী ও ফাতিমা (রা.) সন্তানসন্ততি হলেন; হাসান, হুসাইন, মুহসিন, যয়নব, উম্মে কুলসুম ও রুকাইয়া। মুহসিন গর্ভপাতে ও উম্মে কুলসুম অপ্রাপ্ত বয়সেই ইন্তিকাল করেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পূর্বেই উম্মে কুলসুম জন্মগ্রহণ করেন। হযরত ফাতিমার এক কন্যাকে হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাফর বিবাহ করেন এবং তাঁর জীবদ্দশাতেই ইন্তিকাল করেন। তাদের উভয়ের সন্তান হলেন আলী, আউন, জাফর, আব্বাস ও উম্মে কুলসূম। (মুহাম্মাদ আহমদ ঈসা, বানাতুর রাসূল)

কবি বলেন,

ثم الحسين والحسن ريحانتان

وبفاطمة هي بضعة من مصطفي

জান্নাতের দুই ফুল হযরত ইমাম হাসান ও হুসাইন (রা.) এবং মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কলিজার টুকরা হযরত ফাতিমা (রা.) এর তুফাইলে আমাদের অনুগ্রহ, রহমত ও দয়া করুন। (ড. মুহাম্মদ তাহিরুল কাদিরী, দালায়িলুল বারাকাত ফিত তাহিয়্যাতি ওয়াস সালাওয়াত, পৃষ্ঠা-৬০৩)

কবি ফররুখ আহমদের 'সাত সাগরের মাঝি'

মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম

ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪) বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত কবি। বিংশ শতাব্দীর এই কবি ইসলামী ভাবধারার বাহক। এজন্য তিনি 'মুসলিম রেনেসাঁর কবি' হিসেবেও পরিচিত। তাঁর কবিতায় বাংলার অধঃপতিত মুসলিম সমাজের পুনর্জাগরণের অনুপ্রেরণা প্রকাশ পেয়েছে।

'সাত সাগরের মাঝি' কবি ফররুখ আহমদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। কবি বেনজীর আহমদের অর্থানুকূল্যে ১৯টি কবিতা সম্বলিত কাব্যগ্রন্থটি ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবিতা- পাঞ্জেরী, সিন্দাবাদ, আকাশ-নাবিক, ডাহুক, এই সব রাত্রি ইত্যাদি। অশিক্ষিত, অবহেলিত ও দুর্দশায় নিমজ্জিত বাঙালি মুসলমানদেরকে উজ্জীবিত করার মানসেই রচিত হয়েছে 'সাত সাগরের মাঝি'। মুসলিম সম্প্রদায়ের জীবন ও জীবনের অনুষঙ্গগুলি স্বপ্নালোকে ও আদর্শকে রোমান্টিকতা ও আদর্শিকতার সমন্বয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন কবি তাঁর সাত সাগরের মাঝিতে। বাংলা কবিতায় রেনেসাঁর যে সুরটি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম সৃষ্টি করেছিলেন কবি ফররুখের 'সাত সাগরের মাঝি' তারই পরিপূরক। এ কাব্যে আরবের মরুময়তা ও বিখ্যাত আরব্য উপন্যাস 'আলফা ওয়া লায়লা'র প্রাণস্পর্শী চিত্র ফুটে ওঠেছে মনোহরী রূপ নিয়ে। ঐতিহ্য ও আদর্শিকতার এমন সফল সমন্বয় কাব্যজগতে সত্যিই বিরল।

এ কাব্যের একটি বিখ্যাত কবিতার নামও 'সাত সাগরের মাঝি'। অনন্য সাধারণ এ কবিতার কাহিনী নেয়া হয়েছে আরব্য উপন্যাসের সিন্দাবাদের কাহিনী থেকে। এটি মুসলিম জাগরণ ও ইসলামী রেনেসাঁর প্রতীক। এ কাব্যে সমুদ্র যাত্রাপথে যে বিভিন্ন অনুষঙ্গ উপস্থিত হয়েছে তাদের সৌন্দর্য অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর। নাবিক সিন্দাবাদ ফেনোত্তল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে নানা ঝড়-ঝঞ্ঝা অতিক্রম করে লক্ষ্যে পৌছাবে অর্থাৎ তার উদ্দিষ্ট স্থানে তথা 'হেরার রাজতোরণে' সমবেত হবে। নাবিক সিন্দাবাদের স্বপ্ন ও অভিজ্ঞতা তাঁর বিভিন্ন কবিতায় নানারূপে প্রকাশিত হয়ে শেষে মিলিত হয়েছে এক কেন্দ্রবিন্দুতে। এখানে সিন্দাবাদ হলো প্রতীকী নাবিক। যিনি সঠিক পথের দিশা দিবেন। তাই সিন্দাবাদকে সম্বোধন করে কবি আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন-

ছিঁড়ে ফেল আজ আয়েশি রাতের মখমল অবসাদ
নতুন পানিতে হাল খুলে দাও, হে মাঝি সিন্দাবাদ (সিন্দাবাদ)

মানবতাবাদী কবি আলোচ্য কবিতায় সরাসরি ইসলামের কথা বলেননি। প্রতীকের মাধ্যমে ইসলামী আদর্শের এবং লক্ষ্যের কথা বলেছেন। 'হেরার রাজতোরণ' দিয়ে ইসলামের কথাই বলা হয়েছে। যেমন-

এখানে এখন রাত্রি এসেছে নেমে
তবু দেখা যায় দূরে বহু দূরে হেরার রাজতোরণ
এখানে এখন অজস্রধারা উঠেছে দু'চোখ ছেপে
তবু দেখা যায় দূরে বহু দূরে হেরার রাজতোরণ

কবি ফররুখ আহমদের 'সাত সাগরের মাঝি' শুধু ভাব ও ভাষাতেই নয়, দৃষ্টি এবং শিল্প-নৈপুণ্যেও এর নতুনত্ব আকর্ষণীয়। প্রতিভার ছাপ ফুটে উঠেছে কাব্যটির আগাগোড়ায়। এর সিন্দাবাদ, দরিয়ার শেষ রাত্রি, পাঞ্জেরী প্রভৃতি কবিতায় তিনি বাঙালি মুসলমানদের নবজাগরণের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছেন। 'লাশ' ও 'আউলাদ' কবিতায় যেন দুর্ভিক্ষের বিভীষিকাময় দৃশ্য অমর হয়ে আছে। কবিতা দুটির ভেতর দিয়ে কবি বর্তমান সভ্যতার মুখোশ উন্মোচন করেছেন।

'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা রচিত হয়েছে চল্লিশের দশকের প্রারম্ভে। কবি তখন টগবগে তরুণ। চারিদিকে ব্রিটিশ খেদাও আন্দোলন চলছে। স্বাধীনতার সূর্যোদয়ের খুব বেশি বাকি নেই। এমন আভাসই যেন পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু মুসলিম জাতির জেগে ওঠা নেতৃত্ব যেন সঠিক পথে এগুচ্ছে না। তাই তিনি জাতির কর্ণধারকে 'পাঞ্জেরি' প্রতীকে তুলে ধরেছেন। বার বার প্রশ্ন করছেন- রাত পোহাবার কত দেরি পাঞ্জেরী।'

সমুদ্রযাত্রার প্রতিকূল পরিস্থিতি এবং তা থেকে উত্তরণের আকাঙ্ক্ষার ভেতরে কবি জাতীয় জীবনে বিরাজমান সংকট থেকে উত্তরণে জাতীয় নেতৃত্বের সচেতনতা প্রত্যাশা করেছেন। মূলত রূপকের আড়ালে কবি উক্ত ভাববস্তুই ব্যক্ত করেছেন-

পাঞ্জেরি!
জাগো বন্দরে কৈফিয়তের তীব্র ভ্রুকুটি হেরি
জাগো অগণন ক্ষুধার্ত মুখের নীরব ভ্রুকুটি হেরি
দেখ চেয়ে দেখ সূর্য ওঠার কত দেরি কত দেরি

এ কাব্যের একটি বিখ্যাত রূপক কবিতা 'ডাহুক'। এটিকে ইংরেজ কবি শেলীর 'স্কাইলার্ক' এর সাথে তুলনা করা যায়। কবি শেলী স্কাইলার্কের ডানায় ভর করে আত্মমুক্তির সন্ধান পেয়েছিলেন। কবি ফররুখ আহমদও 'ডাহুক' পাখির মাধ্যমে আত্মমুক্তির সন্ধান পেয়েছেন। কবির রোমান্টিক চেতনায় ডাহুক হলো চির জাগ্রত বিবেক ও পবিত্র আত্মার প্রতীক যা মরমী সাধকের চেতনার সাথে তুলনীয়। কবির ভাষায়-

ঘুমের নিবিড় বনে সেই শুধু সজাগ প্রহরী
চেতনার পথ ধরি চলিয়াছে তার স্বপ্নপরি
মন্থর হাওয়ায়

'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যে কবি অনেক রূপক-প্রতীক ব্যবহার করেছেন। কবি ফররুখ আহমদের রূপক-প্রতীক ব্যবহার প্রসঙ্গে বিশিষ্ট গবেষক রফিকুল ইসলাম বলেছেন- "ফররুখ আহমদ তাঁর অভিজ্ঞতা ও আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করেছেন কয়েকটি প্রতীকের সাহায্যে। 'সিন্দাবাদ' ফররুখ আহমদের একটি বহুল ব্যবহৃত প্রতীক, যে নাবিক নিত্য-নতুন দরিয়ায় তরী ভাসায়, সে নতুন জীবনের তাজা ঘ্রাণের প্রতীক।" 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যে কবি প্রচুর পরিমাণে আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছেন। নজরুলের পর ফররুখ আহমদের মতো আর কোনো কবি সম্ভবত আরবি-ফারসি শব্দ এমন দক্ষতার সাথে ব্যবহার করেননি। তবে ফররুখের আরবি-ফারসি শব্দের নজরুলের ব্যবহারের চেয়ে ভিন্নধর্মী। যেমন-

কেটেছে রঙিন মখমল দিন, নতুন সফর আজ
শুনছি আবার নোনা দরিয়ার ডাক
ভাসে জোরওয়ার মউজের শিরে সফেদ চাঁদির
তাজ, (সিন্দাবাদ)

কবি ফররুখ আহমদের এ কাব্যের প্রকরণকৌশল, শব্দচয়ন এবং বাকপ্রতিমার অনন্য বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। আধুনিকতার সকল লক্ষণ তাঁর কবিতায় পরিব্যাপ্ত। তাঁর কবিতায় রোমান্টিকতা থেকে আধুনিকতায় উত্তরণের ধারাবাহিকতা পরিস্ফুট। কাব্যটি বিখ্যাত উর্দু কবি আল্লামা ইকবালকে উৎসর্গ করা হয়।

করোনা ভ্যাকসিন

মুমিনুল ইসলাম

শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়াবহ স্বাস্থ্য সংকট শুরু হওয়ার সাত মাস পর করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন উদ্ভাবনের দৌড় এখনো চলমান। বিশ্বের ৭০০ কোটি মানুষ একটা সফল টিকার জন্য অধীর আগ্রহে দিন গুণছে। বর্তমানে বিশ্বে ১৭৬টি টিকা আবিষ্কারের কাজ চলছে। তার মধ্যে মানব পর্যায়ের ট্রায়ালে রয়েছে ৩৪টি, ৮টি আছে পরীক্ষার তৃতীয় পর্যায়ে। এ আয়োজনে থাকছে ভ্যাকসিন উদ্ভাবনে এগিয়ে থাকা কোম্পানি ও টিকা নিয়ে চিকিৎসাবিষয়ক আন্তর্জাতিক ম্যাগাজিন নির্ভর আলোচনা।

জার্মানির ভ্যাকসিন: বিএনটি-১৬২

করোনা ভ্যাকসিন আবিষ্কারে প্রথম আশার কথা শোনাল জার্মানি। সুখবরটি এলো ড. উগার শাহিন ও ওজলেম তুরেসি মুসলিম দম্পতির হাত ধরে। তাদের প্রতিষ্ঠিত জার্মান কোম্পানি বায়োনটেক জানিয়েছে ভ্যাকসিনটি নিরাপদ। আমেরিকার ফাইজার কোম্পানির অর্থায়নে তৈরি ভ্যাকসিনটি মানবদেহে প্রয়োগেই সফল ফলাফল দিতে শুরু করছে। যা ইমিউনিটি তৈরি ও রক্তে শ্বেতকণিকা তৈরিতে সহায়তা করে, করোনার বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে ৯০ শতাংশ কার্যকর। ভ্যাকসিনটির নাম দেওয়া হয়েছে বিএনটি-১৬২। তবে ভ্যাকসিনটি বাজারে পাওয়ার জন্য আরো মাস ছয়েক অপেক্ষা করতে হবে।

রাশিয়ার ভ্যাকসিন 'স্পুটনিক-৫'

ভ্যাকসিন দৌড়ে বিশ্বকে সুখবর দিল রাশিয়া। মানব শরীরে এর সফল প্রয়োগে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন রুশ বিজ্ঞানীরা। ভ্যাকসিনটির নাম দেওয়া হয়েছে 'স্পুটনিক-৫'। রাশিয়ার দাবি, 'স্পুটনিক-৫' টিকা প্রয়োগের পর রোগীর শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা ইমিউনিটি তৈরি করতে সফল হয়েছে। চিকিৎসাবিষয়ক সাময়িকী দ্যা ল্যান্সেট একটি প্রতিবেদনে তা সমর্থন করে বলছে, স্পুটনিক-৫ প্রয়োগের পরীক্ষায়, শরীরে করোনাভাইরাসের সঙ্গে লড়াই করার মতো অ্যান্টিবডি তৈরি হচ্ছে এবং বড় কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। রুশ সরকার বলছে, বিশ্বের অন্তত ৫০টি দেশ ইতোমধ্যে ১২০০ মিলিয়ন ডোজ ভ্যাকসিন চেয়ে রেখেছে। জানুয়ারিতে গণহারে ভ্যাকসিন দেওয়ার কথা রয়েছে।

চীনা ভ্যাকসিন

ভ্যাকসিন দৌড়ে এগিয়ে থাকা ১০টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চারটিই চীনের। দেশটির ক্যানসিনো বায়োলজিকস ইনকরপোরেশন ও সেনাবাহিনীর গবেষণা ইউনিটের যৌথ উদ্যোগে তৈরি ভ্যাকসিনটি বেশ সম্ভাবনাময় বলে দাবি করা হয়েছে। বর্তমানে বাজারজাতকরণের চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে এটি। চীনের রাষ্ট্রায়ত্ত ওষুধ প্রস্তুতকারক সাইনোফার্মের গবেষণাধীন প্রতিষেধক জানুয়ারির শুরুতেই বাজারে পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছে দেশটির গণমাধ্যম। এ ছাড়াও চীনের জাতীয় জৈব-প্রযুক্তি গ্রুপ-সিত্রনবিজির অঙ্গ প্রতিষ্ঠান বেইজিং ইনস্টিটিউট অব বায়োলজিক্যাল প্রোডাক্টস এবং উহান ইনস্টিটিউট অব বায়োলজিক্যাল নতুন করোনা ভাইরাস প্রতিষেধক যৌথভাবে প্রস্তুত করছে; সেটিও তৃতীয় পর্যায়ের ট্রায়ালে আছে।

অক্সফোর্ডের ভ্যাকসিন

রাশিয়া প্রথম ভ্যাকসিন আবিষ্কারের ঘোষণা দিলেও বিশ্ববাসী তাকিয়ে অক্সফোর্ডের ভ্যাকসিনের দিকে। ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের দিক থেকেই নয়, ফলাফলেও ব্যতিক্রমী এই ভ্যাকসিন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও ব্রিটিশ সুইডিশ ওষুধ প্রস্তুতকারক জায়ান্ট কোম্পানি অ্যাস্ট্রাজেনেকা যৌথভাবে এটা তৈরি করেছে। ভ্যাকসিনটির নাম ঈযঅফঙী১হ ঈড়া-১৯। প্রতিষেধকটির শেষ পর্যায়ের ট্রায়াল চলছে। এই ভ্যাকসিন প্রয়োগ করার পর মানব শরীরে কোভিড-১৯ প্রতিরোধকারী অ্যান্টিবডি তৈরি হচ্ছে, এমনটাই দাবি গবেষণার প্রধান সারা গিলবার্টের। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে জানুয়ারির শেষে বাজারে আসতে পারে এই ভ্যাকসিন।

বন্টনের নেতৃত্বে থাকবে ইউনিসেফ

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে অন্তত ১০টি ভ্যাকসিন মানবদেহে প্রয়োগ করার কাজ চলছে। বিজ্ঞানীরা আশাবাদী খুব শীঘ্রই করোনার ভ্যাকসিন বাজারজাতকরণ করা হবে। দরিদ্র দেশের মানুষের টিকার চাহিদা মেটানোর জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, দ্যা গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ভ্যাকসিনস অ্যাণ্ড ইমুনাইজেশন (গ্যাভি) ও কোয়ালিশন ফল এপিডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস ইনোভেশনস (সিইপিআই) যৌথভাবে একটি উদ্যোগ গড়ে তুলছে। এর নাম- কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন গ্লোবাল অ্যাকসেস বা কোভ্যাক্স। উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে বিনামূল্যে ও স্বল্পমূল্যে টিকা কিনে মজুদ গড়ে তুলবে কোভ্যাক্স। কোভ্যাক্সের টিকা যৌক্তিকভাবে বিশ্বব্যাপী বন্টনে নেতৃত্ব দিবে ইউনিসেফ।

আমাদের প্রত্যাশা

সাধারণত সংক্রামক রোগের টিকা উদ্ভাবন, পরীক্ষা ও উৎপাদনের প্রক্রিয়া সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। গবেষণা ও উৎপাদন থেকে কার্যকর টিকা মানুষের কাছে পৌছে দিতে সচরাচর সময় লাগে ৫ থেকে ১০ বছর। কিন্তু করোনার ক্ষেত্রে সেটা করা হচ্ছে কয়েক মাসের মধ্যে। তারপরেও উদ্ভাবিত টিকা সবসময় যে সফল হয়, তাও নয়। এ পর্যন্ত মাত্র একটি সংক্রামক রোগের টিকা সফল হয়েছে। সেটি হলো গুটিবসন্ত; যেটি সম্পূর্ণ নির্মূল করা গেছে। কিন্তু তাতেও সময় লেগেছে ২০০ বছর। যক্ষ্মা, পোলিও, টিটেনাস, হাম মাম্পস- এখনও মানুষের সঙ্গ ছাড়েনি। যদিও এসব রোগের টিকা আছে এবং টিকার কল্যাণে অন্তত এসব রোগের মহামারি ঠেকানো সম্ভব হচ্ছে। তাই করোনাও আমাদেরকে পুরোপুরি ছাড়বে কি না বলা যাচ্ছে না। সময় সময় রূপ বদলানোয় বিজ্ঞানীদেরকে নাজেহাল করে ছাড়ছে। তাই করোনার টিকায় শেষ বলতে কিছু নেই, আবার পুরোপুরি নিশ্চিত না হয়ে সফল টিকার কথা বলা যাচ্ছে না। তবে টিকা আবিষ্কারে মহামারি ঠেকানো সম্ভব হবে –এ আমাদের বিশ্বাস।

জীবন জিজ্ঞাসা

জবাব দিচ্ছেন-
মাওলানা আবূ নছর মোহাম্মদ কুতুবুজ্জামান তাফাদার
প্রিন্সিপাল ও খতীব, আল ইসলাহ ইসলামিক সেন্টার
মিশিগান, আমেরিকা।

মো. আনোয়ার হোসেন
ছাতক, সুনামগঞ্জ।

ইমামতির ক্ষেত্রে বিবাহিত হওয়া শর্ত কি না এ বিষয় জানালে উপকৃত হব।

জবাবঃ ইমামতির যোগ্যতা ও উপযুক্ততার ক্ষেত্রে বিবাহিত হওয়া শর্ত নয়। তাই কারো মাঝে ইমামতির অন্যান্য শর্তাবলি পাওয়া গেলে সে অবিবাহিত হলেও ইমামতি করতে পারবে। যদি অবিবাহিত কোনো ইমামের চারিত্রিক দিক থেকে বিপথগামী হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা দেখা দেয় তবে মসজিদ কমিটি ইমামকে বিবাহের ব্যাপারে চাপ প্রয়োগ করতে পারে। কেননা ইমামকে ফাসিকী কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য। এ আশঙ্কায় হয়তো কোনো কোনো মসজিদ কমিটি অবিবাহিত ব্যক্তিকে ইমাম হিসাবে নিযুক্ত করতে চান না।

দ্বীনদারী রক্ষা ও চারিত্রিক পবিত্রতার ক্ষেত্রে অবিবাহিত ব্যক্তির চেয়ে বিবাহিত ব্যক্তিই অধিক নিরাপদ। সে হিসেবে বিবাহিতকে অন্যান্য যোগ্যতা থাকার শর্তে প্রাধান্য দেওয়া সমীচীন বটে। (ফাতাওয়া রহীমিয়াহ; ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩৫১ পৃষ্ঠা, ফাতাওয়া মাহমূদিয়াহ; ৭ম খণ্ড: ৪০ পৃষ্ঠা)

আব্দুস সামাদ রাফি
কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।

(ক) তালকীন কি? (খ) তালকীন করা কি জায়িয? (গ) মৃত ব্যক্তিকে কবরস্থ করার পর কবরের চার কোণায় চারজন বসে কিছু আয়াত তিলাওয়াত করেন। তিলাওয়াত শেষে একজন ব্যক্তি মৃতের বুক বরাবর কবরের পাশে বসে কবরের উপর হাত রেখে বলেন, "ইয়া আব্দাল্লাহ! কুল রাব্বিয়াল্লাহ, দ্বীনিয়াল ইসলাম, হাযা নাবিয়্যী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম" এরপর দুআ করে বিদায় নেন। শরীআতের দৃষ্টিতে এরূপ করা বৈধ কি না? দলীলসহ জানালে খুশি হব।

জবাবঃ (ক) তালকীন শব্দের বিশ্লেষণে 'মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা' কিতাবে এসেছে,

التلقين مصدر لقَّن ، التفهيم مشافهة – إلقاء الكلام على الغير ليأخذ به، ومنه : تلقين الشهادة ، وتلقين المأموم الإمام إذا أغلق عليه في القراءة، وتلقين المحتضر الشهادة

অর্থাৎ, তালকীন لقَّن এর মাছদার (ক্রিয়ামূল) যার অর্থ হচ্ছে, সরাসরি বুঝিয়ে দেওয়া, অন্যকে অনুধাবন করানোর উদ্দেশ্যে কিছু বলা। এর বিভিন্ন প্রকারের আওতায় রয়েছে শাহাদাতের তালকীন, ইমাম কিরাতে আটকা পড়লে মুক্তাদী তা বলে দেওয়া এবং মুমূর্ষুকে কালিমা শাহাদাতের তালকীন প্রভৃতি।

(খ) সহীহ মুসলিম, সুনানে ইবনে মাজাহ, সুনানে নাসায়ী ও মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) ও হযরত আবূ হুরাইরাহ (রা.) প্রমুখ সাহাবায়ে কিরাম সূত্রে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, لقنوا موتاكم لا إله إلا الله "তোমরা মৃতদেরকে (মুমূর্ষুদেরকে) তালকীন করো যে আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই"। উক্ত হাদীসে বর্ণিত موتى (মৃত) শব্দকে বাহ্যিক ও প্রকৃত অর্থে প্রয়োগ করলে সরাসরি মৃতদেরকে দাফনের পর তালকীন করা হাদীস শরীফ থেকে সাব্যস্ত হয়। তবে উক্ত হাদীসের موتى (মৃত) শব্দকে রূপকার্থে মুমূর্ষু অর্থে প্রয়োগ করে অধিকাংশ মনীষী মুমূর্ষু ব্যক্তিকে মৃত্যুর পূর্বে কালিমার তালকীন অর্থে হাদীসকে প্রয়োগ করেছেন, যা সর্বসম্মত মতানুযায়ী সুন্নাত।

দাফন পরবর্তী তালকীনের সমর্থনে স্বতন্ত্র হাদীসের বর্ণনা রয়েছে। ইমাম তাবরানী তদ্বীয় المعجم الكبير গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন,

عن سعيد بن عبد الله الأودي، قال: شهدت أبا أمامة وهو في النزع، فقال: إذا أنا مت، فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصنع بموتانا، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " إذا مات أحد من إخوانكم، فسويتم التراب على قبره، فليقم أحدكم على رأس قبره، ثم ليقل: يا فلان بن فلانة، فإنه يسمعه ولا يجيب، ثم يقول: يا فلان بن فلانة، فإنه يستوي قاعدا، ثم يقول: يا فلان بن فلانة، فإنه يقول: أرشدنا رحمك الله، ولكن لا تشعرون. فليقل: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأنك رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا، وبالقرآن إماما، فإن منكرا ونكيرا يأخذ واحد منهما بيد صاحبه ويقول: انطلق بنا ما نقعد عند من قد لقن حجته، فيكون الله حجيجه دونهما ". فقال رجل: يا رسول الله، فإن لم يعرف أمه؟ قال:فينسبه إلى حواء، يا فلان بن حواء.

-হযরত সাঈদ ইবনে আব্দিল্লাহ আল আওদী (রা.) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি হযরত আবূ উমামাহ (রা.) এর মৃত্যুকালে তার কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বললেন, আমার মৃত্যুর পর তোমরা আমার ক্ষেত্রে সেরূপ আচরণ করবে যেমনিভাবে আল্লাহর রাসূল (সা.) আমাদের মৃতদের ব্যাপারে নির্দেশ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে আদেশ করেছেন আমাদের কারো মৃত্যু হলে তাকে কবরস্থ করার পর যেন শিয়রের পাশে দাঁড়িয়ে বলে, হে অমুকের ছেলে অমুক! সে তখন শুনবে তবে কোনো উত্তর দিবে না। অতঃপর বলবে, হে অমুকের পুত্র অমুক! তখন সে সোজা হয়ে বসবে। অতঃপর বলবে, হে অমুকের পুত্র অমুক! তখন সে বলবে, আল্লাহ আপনাকে রহম করুন! কি বলতে চান? কিন্তু তোমরা তা উপলব্ধি করতে পারবে না। তখন সে যেন বলে, তুমি স্মরণ কর, দুনিয়া থেকে যাবার সময় তুমি "আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর বান্দাহ ও রাসূল" বলে যে বিশ্বাসের সাক্ষ্য দিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিলে এবং তুমি আল্লাহকে রব, ইসলামকে ধর্ম, মুহাম্মদ (সা.) কে নবী এবং কুরআনকে পথপ্রদর্শক হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট ছিলে। তখন ফেরেশতাদ্বয়ের একজন অন্য জনের হাত ধরে বলবেন, চল এবার যাই। এমন লোকের কাছে বসে

লাভ কী যাকে তার আখিরাতের (মুক্তির) দলীল শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে (জবাব বলে দেওয়া হয়েছে)। অতঃপর ফিরিশতার পর আল্লাহ তাআলাই তার জবাব গ্রহণ করবেন। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যদি সে ব্যক্তির মায়ের নাম ঐ লোকটি না জানে তাহলে কিরূপ সম্বোধন করবে? তিনি বললেন, মা হাওয়ার নামের সাথে সম্পর্কিত করবে যথা: ইয়া ফুলান ইবনা হাওয়া বলবে। (আল মু'জামুল কাবীর: ৮ম খণ্ড, ২৪৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৭৯৭৯, আল বিনায়াহ শরহুল হিদায়াহ: ৩য় খণ্ড, ১৭৭ পৃষ্ঠা, যাদুল মায়াদ: ১ম খণ্ড ৫০৪ পৃষ্ঠা)

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের দৃষ্টিতে কবরে মায়্যিতকে তালকীন শরীআতসম্মত এবং এর দ্বারা মৃত ব্যক্তি উপকৃত হয়। কেননা মৃত্যুর পর পরই রূহ ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং মৃত ব্যক্তি সবকিছু অনুধাবনে সক্ষমতা রাখে। বাতিল ফিরকাহ মু'তাজিলাহ তা অসম্ভব বলে অস্বীকার করে। (রদ্দুল মুহতার: ২য় খণ্ড-১৯১ পৃষ্ঠা, আল জাওহারাতুন নায়্যিরাহ: ১ম খণ্ড -১০২ পৃষ্ঠা, আল হাবী লিল ফাতাওয়া: ২য় খণ্ড- ২১১ পৃষ্ঠা, তাবয়ীনুল হাক্বায়িক্ব: ১ম খণ্ড- ২৩৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

শায়খ ইবনে তাইমিয়াও বলেছেন, অধিকাংশ মনীষী তালকীনকে জায়িয বলেছেন। তার ফাতাওয়া'র মধ্যে আছে, হযরত আবূ উমামা বাহিলী (রা.) ও হযরত ওয়াসিলাহ ইবনুল আসকা (রা.)সহ কতিপয় সাহাবায়ে কিরাম তালকীন করার নির্দেশনা দিয়েছেন। তাই অধিকাংশ মনীষীদের মতে তা জায়িয। কেউ কেউ একে মুস্তাহাব বলে অভিহিত করেছেন। (ইকতিদাউস সিরাতিল মুস্তাকীম: ২য় খণ্ড ১৭৯ পৃষ্ঠা, আল ফাতাওয়াল কুবরা: ৩য় খণ্ড পৃষ্ঠা ২৪ দ্রষ্টব্য)

(গ) মৃতের তালকীনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বাক্য সর্ম্পকে ফকীহগণের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। যাদুল মাআদ গ্রন্থে আছে,

وقد ذكر سعيد بن منصور في "سننه" عن راشد بن سعد، وضمرة بن حبيب، وحكيم بن عمير، قالوا: إذا سوي على الميت قبره، وانصرف الناس عنه، فكانوا يستحبون أن يقال للميت عند قبره: يا فلان! قل: لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله ثلاث مرات، يا فلان! قل: ربي الله ودين الإسلام، نبي محمد، ثم ينصرف.

-সাঈদ ইবনে মানসুর তদ্বীয় সুনানে হযরত রাশীদ ইবনে সা'দ, দ্বামরাহ ইবনে হাবীব এবং হাকীম ইবনে উমাইর থেকে বর্ণনা করেছেন যে তারা বলেছেন, মায়্যিতের দাফন সমাপ্ত হলে এবং লোকগণ চলে গেলে মায়্যিতের উদ্দেশ্যে তার কবরের পাশে থেকে হে অমুকের পুত্র অমুক! তুমি বলো- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (একথা তিনবার বলবে)। অতঃপর বলবে হে অমুক! তুমি বল- আমার রব আল্লাহ, আমার ধর্ম ইসলাম, আমার নবী মুহাম্মদ (সা.)। এরপর চলে যাবে। তারা (পূর্বোক্ত ব্যক্তিবর্গ) এরূপ বলা মুস্তাহাব মনে করতেন। (যাদুল মাআদ: ১ম খণ্ড, ৫০৪ পৃষ্ঠা)

মোটকথা, এক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে কবরের প্রশ্নের উত্তর সম্বলিত যে কোনো বাক্য ব্যবহার বৈধ রয়েছে। যেমন, ইয়া ফুলান ইবনা ফুলান বা ইয়া আব্দাল্লাহ ইবনা আব্দিল্লাহ! উযকুর দ্বীনাকাল্লাযী কুনতা আলাইহি ওয়া কাদ রাদ্বীতা বিল্লাহি রাব্বাউ ওয়া বিল ইসলামি দ্বীনাউ ওয়া বিমুহাম্মাদিন (সা.) নাবিয়্যা ইত্যাদি।

তাই প্রশ্নে উল্লেখিত নিয়মে তালকীন শরীয়তসম্মত এবং বৈধ।

মো. রায়হান হোসেন
বর্ষিজোড়া, মৌলভীবাজার।

একজন লোক এ বিশ্বাস পোষণ করে যে আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় এবং রাসূল (সা.) আল্লাহর বান্দাহ ও রাসূল। কিন্তু আল্লাহ ও রাসূল (সা.) এর মুহব্বত কিংবা আনুগত্যের প্রতি তেমন আগ্রহবোধ করে না। যদি সে ব্যক্তি ঈমান, ইসলামের প্রতি কোনোরূপ বিদ্বেষ পোষণ করে না এমন চরিত্রের হয় তাহলে পরকালে সে কি জান্নাতে যাওয়ার আশা রাখতে পারে?

জবাব: কোনো ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) কে যথার্থ ভাবে বিশ্বাস করে নিলে অর্থাৎ কারো মাঝে তাওহীদ ও রিসালাতসহ দ্বীনের মৌলিক বিষয়ের বিশ্বাস থাকলে এটাকে তার ইজমালী বা সংক্ষিপ্ত ইমানের পর্যায়ভুক্ত ধরে নেয়া হবে। এ বিশ্বাসের উপর তার মৃত্যু হলে সে জান্নাতে যাওয়ার আশা রাখতে পারে। এক্ষেত্রে সে গোনাহের কারণে প্রথমে জাহান্নামে গেলেও পরিশেষে তার নাজাতের ব্যবস্থা হবে। এ মর্মে হাদীস শরীফে এসেছে,

عن معاذ بن جبل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة

-হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, যার মৃত্যু পূর্ববর্তী শেষ কথা হবে "আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই" সে (এক সময়) জান্নাতে যাবে। (সুনানে আবী দাউদ, হাদীস নং-৩১১৬, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ২২০৩৪)

আর কোনো বান্দা শিরক না করলে আল্লাহ চাইলে নিজ দয়ায় তাকে ক্ষমাও করে দিতে পারেন।

কোনো ব্যক্তির মধ্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি মুহব্বত ও আনুগত্যের কমতি কিংবা নেক আমলের প্রতি উদাসীনতা থাকলে সে ফাসিক (পাপাচারী) হিসেবে পরিগণিত হবে। তাকে কাফির বলা যাবে না। এটি হচ্ছে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের আকীদাহ। উল্লেখ্য যে, খারিজী বাতিল ফিরকাহ এমন অপরাধী ব্যক্তিকে কাফির বলে থাকে।

আব্দুল হাই মাসুম

একাধিক মায়্যিত/মায়্যিতার জানাযা একসঙ্গে একবারে আদায় করা যাবে কি?

জবাব: একাধিক মায়্যিত/মায়্যিতার জানাযার নামাজ একই সঙ্গে একবারে আদায় করার ক্ষেত্রে শরীআতে কোনো বাঁধা নেই। তাই ফুকাহায়ে কিরামের সকলেই তা জায়িয হওয়ার বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন। তবে আলাদা আলাদা পড়া উত্তম। আলাদা করে পড়লে উত্তম হওয়ার দৃষ্টিকোণে যিনি অগ্রাধিকার পাবেন তার জানাযা আগে অত:পর যিনি তার কাছাকাছি মর্যাদার তার জানাযা এবং মর্যাদার দিক থেকে যিনি সবার চেয়ে নিম্ন স্তরের সবার শেষে তার জানাযা আদায় করা হবে। আর একত্রে আদায় করলে ইমামের সবচেয়ে কাছে ঐ মৃতের লাশ রাখা হবে যিনি সর্বোত্তম অত:পর তার কাছে রাখা হবে যিনি তার পরের। এভাবে কিবলার দিকে সারিবদ্ধ করে সবগুলো লাশ পাশাপাশি অবস্থানে রাখা বাঞ্চনীয় হবে। আর চাইলে কাতারবদ্ধ করেও রাখা যাবে, যেমন: পুরুষদের লাশ একটি কাতারে আর নারীদের লাশ অন্য কাতারে। (তথ্যসূত্র : আল মাবসূত: ২/৬৫, রদ্দুল মুহতার: ২/২১৮, দুররুল মুখতার: ১/১২০, মারাকিল ফালাহ: ১/২২০, নুরুল ইজাহ: ১/১১৮, তাহতাবী: ১/৫৯২, তুহফাতুল ফুকাহা: ১/২৫০)

আব্দুল্লাহ আল মাওসুফ
ফাযিল (সম্মান) ৩য় বর্ষ, সিলেট সরকারি আলিয়া মাদরাসা

চার মাযহাবের চার ইমাম যে কোনো একটি মাযহাবের অনুসরণ না করে কেন চারটি মাযহাব তৈরী করলেন? এর কি প্রয়োজনীয়তা ছিল? জানতে চাই।

জবাব: চার মাযহাবের চার ইমাম একত্র হয়ে একই সময়ে চারটি মাযহাব তৈরি করেননি এবং তাদের নিছক ব্যক্তিগত মতের কারণে চার মাযহাব হয়নি। এমনকি তারা এক যুগেরও ছিলেন না। সুতরাং তাদের সমালোচনা না করে বরং তাদের অবদানের শুকরিয়া আদায় করা উচিত। কুরআন-সুন্নাহতে একই বিষয়ে পরস্পরবিরোধী একাধিক বর্ণনা থাকার প্রেক্ষিতে একাধিক মাযহাব হয়েছে। যে ইমাম যে বর্ণনাকে তার শর্ত অনুযায়ী শক্তিশালী মনে করেছেন তিনি সে বর্ণনা অনুযায়ী মত দিয়েছেন। এটিই তাঁর মাযহাব। এটি কোনো ব্যক্তিগত মত নয়। বরং কুরআন-সুন্নাহ থেকে নির্গত ফতওয়া। বর্তমান সময়ে যে সকল মাযহাববিরোধী সকলের ক্ষেত্রে এক মাযহাব বা একই ধরনের আমলের দাবি তুলেন তাদের পক্ষেও সকল মাসআলায় এক সমান ফাতাওয়া দেওয়া সম্ভব নয়। যেহেতু কুরআন-সুন্নাহর দলীলের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও মতপার্থক্য রয়েছে।

একজন অনুসন্ধানী পাঠক হাদীসের কিতাবাদি অধ্যয়ন করলে সুন্নাহ'র দলীলের ভিন্নতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন। যেমন:
তাকবীরের সময় হাত উঠানো সম্পর্কে হাদীস শরীফে বিভিন্ন ধরনের বর্ণনা রয়েছে।

১. হযরত মালিক বিন হুয়াইরিস থেকে বর্ণিত,
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذى بهما أذنيه
-রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকবীরে তাহরীমার সময় উভয় হাত কান বরাবর উঠাতেন। (সহীহ মুসলিম: ৮৬৬)

২. হযরত বারা ইবনে আযিব (রা.) বলেছেন,
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر لافتتاح الصلاة رفع يديه حتى يكون إبهاماه قريبا من شحمتي أذنيه. (طحاوى)
-নবী (সা.) নামায শুরুর তাকবীর যখন দিতেন তখন দুই হাত এমনভাবে ওঠাতেন যে, বৃদ্ধাঙ্গুল কানের লতির কাছাকাছি থাকত। (তাহাবী)

৩. হযরত কাতাদা (রা.) বর্ণিত,
إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. (مسلم)
-তিনি নবী করীম (সা.) কে দেখেছেন, দুই হাত কানের লতি বরাবর উপরে ওঠাতে। (সহীহ মুসলিম)

৪. হযরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত,
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذوا منكبيه إذا افتتح الصلاة
-রাসূলুল্লাহ (সা.) নামায আরম্ভ করার সময় উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন। (সহীহ মুসলিম)

৫. হযরত ওয়াইল বিন হুজর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে নির্দেশপূর্বক বলেন,
إذا صليت فاجعل يديك حذاء أذنيك والمرأة تجعل يديها حذاء ثدييها
-তুমি যখন নামায আরম্ভ করবে উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে এবং মহিলারা তাদের হাত বুক পর্যন্ত উঠাবে। (তাবারানী)

এ হাদীসসমূহে ভিন্নধর্মী বর্ণনা রয়েছে। এর মধ্যে একটি বর্ণনার আলোকে মালিকীদের মতে, কাঁধ বরাবর হাত উঠানো মুস্তাহাব। শাফিঈদের মতে, রাফয়ে ইয়াদাইনের পরিপূর্ণ রূপ হলো, পুরুষ ও মহিলা উভয়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি কানের লতি বরাবর, অন্যান্য আঙ্গুলসমূহ কান বরাবর ও হাতের তালু কাঁধ বরাবর রাখবে। হানাফীদের মতে, পুরুষরা কান বরাবর এবং মহিলারা কাঁধ বরাবর হাত উত্তোলন করবে। (আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ)

প্রত্যেক মাযহাবের দলীল পূর্বোক্ত কোনো না কোনো হাদীসে রয়েছে। এরূপ দলীলের ভিন্নতার কারণে একাধিক মাযহাব হয়েছে। মাযহাববিরোধীদের পক্ষেও সকল মাসআলায় এক সমান ফতওয়া দেওয়া সম্ভব নয়। তাদের পরস্পরের মধ্যেও বিভিন্ন বিষয়ে ইখতিলাফ পরিলক্ষিত হয়। যেমন: সিজদায়ে যাওয়ার সময় রাফয়ে ইয়াদাইন করবে কি না এ বিষয়ে মাযহাববিরোধীদের গ্রহণযোগ্য শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায এবং শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উছায়মীন এর মত হলো- সিজদায় যাওয়ার সময় রাফয়ে ইয়াদাইন করবে না। পক্ষান্তরে, শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী এবং আব্দুল হামীদ ফাইযীর মত হলো- সিজদায় যাওয়ার সময় রাফয়ে ইয়াদাইন করতে পারবে। এভাবে বিভিন্ন মাসআলায় তাদের শত শত ইখতিলাফ রয়েছে। তাদের পারস্পরিক ইখতিলাফ নিয়ে বহু গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং এক মাযহাবের দাবি সম্পূর্ণ অমূলক, অবাস্তব ও অসম্ভব।

মাযহাব মূলত চারটি ছিল না। মুজতাহিদ কেবল চারজন ছিলেন না। আরো অনেক মুজতাহিদের মাযহাব বা মত-অভিমত রয়েছে। কিন্তু মুসলিম উম্মাহ চারজনের মাযহাব গ্রহণ করেছে। অন্যদের মাযহাব গ্রহণ করেনি। তাই এ চার মাযহাব বিষয়ে উম্মাহর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং বর্তমানে চার মাযহাবের বাইরে অন্য কোনো মত বা মাযহাব গ্রহণযোগ্য হবে না।

ইজতিহাদ ও মাযহাব বিষয়ে মূলকথা হলো-
ইজতিহাদ বা গবেষণা করার যোগ্যতাসম্পন্ন সকল ব্যক্তির জন্য কুরআন সুন্নাহতে সরাসরি নেই এমন বিষয়ে কিংবা যে বিষয়াবলি অস্পষ্ট তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ কিংবা সমাধানে আপন ইজতিহাদ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তদনুসারে আমল করা অপরিহার্য। অতীতে এ স্তরের ব্যক্তিগণের সংখ্যা অনেক ছিলেন। কিন্তু তাদের মধ্য থেকে চার জনের গবেষণা মূলনীতি (উসূল)সহ পূর্ণতা লাভ করেছে। তারা যে সকল বিষয় কুরআন-সুন্নাহতে সরাসরি নেই কিংবা এতদুভয়ের সকল অস্পষ্ট বিষয়াবলির উদ্দেশ্য উদঘাটনে সঠিক মূলনীতির (উসূলের) ভিত্তিতে গবেষণা করে সুস্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছেন। অধিকন্তু নব উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে যোগ্যতাসম্পন্ন মুজতাহিদ/ফকীহগণের জন্য অনুসরণযোগ্য মূলনীতি প্রণয়ন করে পরবর্তি সময়ের সকল মুসলমানের জন্য সমাধানের পথ তৈরী করেছেন। এ চারজনের যে কোনো একজনের অনুসরণ শরীআতের ইজতিহাদ সম্বলিত বিধানাবলির শুদ্ধ আমলের ক্ষেত্রে অমুজতাহিদ সকল লোকের জন্য ওয়াজিব (অপরিহার্য)।

চার মাযহাবের ইমামগণ কুরআন-সুন্নাহ'র জ্ঞানে যথার্থ জ্ঞানী ছিলেন। আর জ্ঞানীদের থেকে জেনে আমল করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (النحل: ٤٣)
-জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস করে যদি তোমাদের জানা না থাকে। (সূরা আন নাহল, আয়াত: ৪৩)

মহান আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন,
فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (التوبة: ٢٢١)

-তাদের প্রত্যেক দলের থেকে কতিপয় লোক কেন দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে বের হলো না যারা তাদের নিকট ফিরে এসে তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারতো। (সূরা তাওবাহ: ১২২)

এ মর্মে হাদীস শরীফে এসেছে-

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ " كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ ". قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ " فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ". قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ " فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلاَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ". قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلاَ آلُو. فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَدْرَهُ وَقَالَ " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ ".

-হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন তাকে ইয়ামানে পাঠালেন তখন বললেন, তোমার নিকট যখন কোনো বিষয় আনা হবে, তখন তুমি কিসের ভিত্তিতে এর ফায়সালা করবে? তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাব মুতাবিক। নবী (সা.) বললেন, তুমি যদি আল্লাহ্‌র কিতাবে এর কোনো ফায়সালা না পাও? মুআয (রা.) বললেন, তাহলে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সুন্নাত অনুযায়ী। নবী (সা.) বললেন, তুমি যদি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সুন্নাত এবং আল্লাহর কিতাবে এর ফায়সালা না পাও? মুআয (রা.) বললেন, তাহলে আমি ইজতিহাদ করবো এবং অলসতা করবো না। তখন নবী (সা.) মুআযের বুকে হাত মেরে বললেন, সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি তাঁর রাসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রতিনিধিকে আল্লাহর রাসূলের মনঃপুত কাজ করার তাওফীক দিয়েছেন। (আবূ দাউদ: ৩৫৯২, তিরমিযী)

উপরোক্ত হাদীসে স্পষ্টত উল্লেখ হয়েছে যে, যে সকল বিষয়াবলি সরাসরি কুরআন বা সুন্নাহতে পাওয়া যায় না এমন বিষয়ে মুজতাহিদ গবেষণা করে (কিয়াসের মাধ্যমে) সিদ্ধান্ত নিবেন এবং তদনুসারে আমল করবেন।

আর এ কারণেই ইমামগণ স্বতন্ত্রভাবে ইজতিহাদ করেছেন। আর যেহেতু ইজতিহাদের মূলনীতিতে ভিন্নতা ছিল তাই সিদ্ধান্ত ভিন্ন ভিন্ন হয়েছে। তবে যোগ্যতাসম্পন্ন মুজতাহিদের ইজতিহাদে কখনো ভুল হলেও তারা পুরস্কৃত ও সওয়াব প্রাপ্ত হন। এ সম্পর্কে হাদীস শরীফে এসেছে:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ ".

-হযরত আমর ইবনে আস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে এ কথা বলতে শুনেছেন, কোনো হাকিম (মুজতাহিদ) ইজতিহাদে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছলে তার জন্য আছে দুটি পুরস্কার। আর হাকিম (মুজতাহিদ) ইজতিহাদে ভুল করলে তার জন্যও রয়েছে একটি পুরস্কার। (সহীহ বুখারী: ৭৩৫২)

মোটকথা, ইমামগণের ইজতিহাদপ্রসূত ভিন্নতা রাসূল (সা.) এর সাধারণ উম্মতের জন্য শরীআতের আমলকে সহজতর করেছে এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সুন্নাহ তথা আমলযোগ্য সকল হাদীসকে আমলে এনে দিয়েছে। তাই হাদীস শরীফে এ মর্মে এসেছে: اختلاف أمتي رحمة "আমার উম্মতের মতানৈক্য রহমত তুল্য।" (মিরকাত শরহে মিশকাত: ১/২০, শরহুন্নববী আলা মুসলিম: ১১/৯২)

শেখ মো: সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
বাহরাইন

বর্তমানে বাইরের দেশ থেকে কেউ বাংলাদেশে টাকা পাঠালে টাকা উঠানোর সময় ২% করে বর্ধিত হারে ব্যাংক থেকে টাকা দেওয়া হয়। এটি হালাল নাকি সুদ? জানতে চাই।

জবাব: প্রবাসীগণ বাংলাদেশের বাইরের দেশ থেকে যে টাকা পাঠান ঐ টাকা উঠানোর সময় এর উপর যে ২% বর্ধিত টাকা ব্যাংক থেকে দেওয়া হয় তা সরকারের পক্ষ থেকে প্রণোদনা। বাংলাদেশ সরকার রেমিটেন্সের মাধ্যমে দেশের আর্থিক অবস্থাকে আরো গতিশীল করার জন্য প্রবাসীদেরকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রণোদনা হিসেবে রাজস্ব খাত থেকে এ অর্থ প্রদান করে থাকে। তাই তা সুদ নয় বরং পুরস্কারতুল্য দান, যা হালাল।

লায়লা পারভীন
জয়পাশা, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার

আমাদের দেশে মৃতের সওয়াব রেসানীর উদ্দেশ্যে জায়িয মনে করে অনেকে 'ঈসালে সাওয়াব' করে থাকেন আবার অনেকে এটাকে বিদআত বলেন। কোনটি সঠিক? জানতে চাই।

জবাব: 'ঈসালে সওয়াব' এর অর্থ হচ্ছে অন্যের নিকট সওয়াব পৌঁছানো। প্রচলিত অর্থে ঈসালে সওয়াব বলতে কোনো নেক কাজের সওয়াব কোনো মৃত ব্যক্তিকে দান করে দেওয়া বুঝায়। এ ব্যাপারে ভ্রান্ত মুতাজিলা সম্প্রদায়ের মত হলো- মৃত ব্যক্তি কেবল নিজের কৃতকর্মের প্রতিদান পাবে, অন্যের দ্বারা সম্পাদিত কোনো আমলের সওয়াব দ্বারা মায়্যিত উপকৃত হয় না। তাই তাদের মতে এটি জায়িয নয়। আর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত তথা চার মাযহাবের জমহুর উলামায়ে কিরামের মত অনুযায়ী কোনো নেক আমলের সাওয়াব আমলকারী মায়্যিতকে দান করলে সে সওয়াব মায়্যিতের নিকট পৌঁছে এবং এর দ্বারা মায়্যিত উপকৃত হয়। কেউ কেউ দৈহিক ইবাদাত যথা- নামায, রোযা ইত্যাদির সওয়াব পৌঁছে না বলে মন্তব্য করলেও ইমাম আবূ হানিফা (র.)সহ অধিকাংশ ইমামগণের মতে এগুলোর নেকি দ্বারাও মায়্যিত উপকৃত হন। এ সম্পর্কে আল বাহরুর রাইক ও আল হিদায়াহ প্রভৃতি গ্রন্থে আছে,

الأصل في هذا الباب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة أو غيرها عند أهل السنة والجماعة لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ضحى بكبشين أملحين أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته ممن أقر بوحدانية الله تعالى وشهد له بالبلاغ.

-আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মতে কোনো ব্যক্তি নামায, রোযা, সদকা ইত্যাদি নেক আমলের সওয়াব অন্যকে দান করার অধিকার রাখে। কেননা হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে রাসূল (সা.) দুটি ভেড়া কুরবানী করেছেন একটি নিজের পক্ষ থেকে এবং অন্যটি তাঁর সে সকল উম্মতের পক্ষ থেকে যারা আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর [রাসূল (সা.)] রিসালাতের সাক্ষ্য দিয়েছে। (আল হিদায়াহ:১/১৭৮, আল বাহরুর রাইক: ৩/৬৩, তাবয়ীনুল হাকাইক:২/৮৩)

আকায়িদে নাসাফী গ্রন্থে এসেছে-

دعاء الأحياء للأموات وصدقتهم عنهم نفع لهم

-মৃতদের উদ্দেশ্যে জীবিতগণের দুআ কিংবা সদকাহ তাদের উপকার সাধন করে।

ফরয, নফল সকল প্রকার ইবাদাতের সওয়াব দান করা হানাফী ফকীহগণের মতানুসারে বৈধ। আল বাহরুর রাইক কিতাবে এসেছে,

وظاهر إطلاقهم يقتضي أنه لا فرق بين الفرض والنفل فإذا صلى فريضة وجعل ثوابها لغيره فإنه يصح لكن لا يعود الفرض في ذمته

-ফুকাহাগণের শর্তহীন বক্তব্য থেকে বাহ্যত কোনো পার্থক্য ব্যতিত ফরয কিংবা নফল উভয় প্রকার ইবাদাতের সওয়াব অন্যকে দান করা যায় বলেই প্রতীয়মান হয়। তাই কেউ ফরয নামায পড়ে যদি সে নামাযের সওয়াব অন্যকে দান করে তাহলে তা শুদ্ধ হবে এবং এর কারণে তার যিম্মায় উক্ত ফরয নামায পুনর্বার পড়া আবশ্যক হবে না। (আল বাহরুর রাইক; ৩য় খণ্ড,পৃষ্ঠা:৬৪)

ঈসালে সওয়াবের ব্যাপারে কোনো আনুষ্ঠানিকতা অপরিহার্য নয়। ব্যক্তিগতভাবে যে কোনো নেক কাজের সওয়াব আমলকারী ব্যক্তি অন্যকে যখন ইচ্ছা দান করতে পারে। তবে দিন, তারিখ ধার্য করে সম্মিলিতভাবে ঈসালে সওয়াব সহ যে কোনো নেক কাজের আয়োজন করা জায়িয ও শরীআত সম্মত। এ সম্পর্কে হাদীস শরীফে এসেছে,

عن أبي وائل، قال: كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم؟ قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها، مخافة السآمة علينا

-হযরত আবূ ওয়াইল (রা.) থেকে বর্ণিত যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) প্রতি বৃহস্পতিবার মানুষকে নসীহত করতেন। জনৈক ব্যক্তি তাকে বলল: হে আবূ আব্দির রহমান! আমার একান্ত বাসনা যে যদি আপনি প্রতিদিন আমাদেরকে নসীহত করতেন? জবাবে তিনি বললেন: শুন, আমার এমন না করার কারণ হচ্ছে যে আমি তোমাদেরকে বিরক্তিকর অবস্থায় নিয়ে যেতে অপছন্দ করি। আর আমি তোমাদেরকে মাঝে মধ্যে নসীহত করি যেমন রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে মাঝে মধ্যে নসীহত করতেন আমাদের বিরক্তির আশঙ্কায়। (সহীহ বুখারী শরীফ; হাদীস নং: ৭০, ইবনে হিব্বান; হাদীস নং: ৪৫২৪)

বর্ণিত হাদীসে নির্দিষ্টভাবে প্রতি বৃহস্পতিবার হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) এর আনুষ্ঠানিক ওয়ায নসীহত করার বিষয় থেকে যে কোনো বৈধ নেক কাজের জন্য দিন, তারিখ নির্ধারণ করার বৈধতাসহ আনুষ্ঠানিকতারও বৈধতা প্রমাণিত।

সুতরাং উপরোল্লেখিত দলীল-প্রমাণের আলোকে দিন, তারিখ ধার্য করে আনুষ্ঠানিক ঈসালে সাওয়াবের প্রক্রিয়া মুস্তাহাব আমল। একে বিদআত বলা অসমিচীন।

বশির আহমদ

লালার গাঁও, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট

'ওয়াহাবী মতবাদ' কি? সম্প্রতি দেওবন্দী ধারার একটি ম্যাগাজিনে স্বীয় উলামাদেরকে ওয়াহাবী সাব্যস্ত করে তাদের বিরোধীদেরকে কবর ও মাজার পূজারী আখ্যায়ন করা হয়েছে। বিষয়টি কি সঠিক? সবিস্তারে জানতে চাই।

জবাব: ওহাবী মতবাদ ইসলামের নামে প্রচারিত একটি ভ্রান্ত (বাতিল) মতবাদ। প্রসিদ্ধ বাতিল ফিরকাহ খারিজীদের আকীদা ও কর্মপন্থার সাথে তাদের মিল পাওয়া যায়। এর প্রবর্তক মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব নজদী। তার জন্মস্থান ঐ 'নজদ' নামক স্থানে যেখান থেকে শয়তানের শিং এর বহি:প্রকাশ হবে বলে রাসূলুল্লাহ (সা.) হাদীস শরীফে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর ফলাফল হিসেবে তার প্রবর্তিত ও প্রচারিত ওহাবী মতবাদের মাধ্যমে ইসলামের আদর্শ বহির্ভূত ধ্বংসাত্মক আকীদার যে বিষ বৃক্ষরোপিত হয়েছে এটিকেই 'শয়তানের শিং' হিসেবে জগত বরেণ্য হকপন্থী মনিষীগণ মনে করেন। এ বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ হানাফী ফাতাওয়া গ্রন্থ 'ফাতাওয়ায়ে শামী'তে এসেছে,

كما وقع في زماننا في أتباع عبد الوهاب الذين خرجوا من نجد وتغلبوا على الحرمين وكانوا ينتحلون مذهب الحنابلة، لكنهم اعتقدوا أنهم هم المسلمون وأن من خالف اعتقادهم مشركون، واستباحوا بذلك قتل أهل السنة وقتل علمائهم . (رد المحتار: ٤/٢٦٢)

-আমাদের যুগে মুহাম্মদ ইবনে আব্দিল ওয়াহাবের অনুসারীদের দ্বারা (নাজায়িয) বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছে। যারা নজদের এলাকা থেকে বের হয়ে হারামাইন শরীফাইনের দখলদার হয়েছে। তারা নিজেদেরকে হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী বলে দাবী করে, অথচ তা অযৌক্তিক। কেননা তারা বিশ্বাস করে কেবল তারাই মুসলমান। আর যারা তাদের আকীদার পরিপন্থী তারা মুশরিক। আর এ সূত্র অনুযায়ী তারা আহলে সুন্নাহ পন্থীদেরকে ও তাদের আলিমগণকে হত্যা করা বৈধ মনে করে। (নাউযুবিল্লাহ)

দেওবন্দের আকাবীর সকলেই হানাফী মাযহাবপন্থী হওয়ার বিষয় তাদের লিখিত কিতাবের সূত্রে প্রমাণিত। দেওবন্দের উলামা মাশায়িখ তাদের লিখিত কিতাবে ওয়াহাবী বলতে গায়র মুকাল্লিদ ভ্রান্ত লা মাযহাবীগণকে বুঝিয়েছেন ও সংজ্ঞায়িত করেছেন। এমনকি তাদের কেউ কেউ ওহাবীদেরকে তাদের ভ্রান্ত আকীদার কারণে বার বার 'ওহাবীয়াহ খবীছাহ' নাপাক ওয়াহাবী আখ্যায়ন করেই ক্ষান্ত হননি বরং রাসূল (সা.) এর শানে ওহাবী মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব নজদীর বেয়াদবীপূর্ণ উক্তিকে কুফুরীতুল্য বলে ফতওয়া দিয়েছেন।

তাছাড়া দেওবন্দ ধারার আলিমগণ উপমহাদেশের গায়র মুকাল্লিদ (আহলে হাদীস) সম্প্রদায়ের প্রাচীন নাম ওয়াহাবী ছিল বলে তাদের পুস্তকাদিতে দ্বিধাহীনভাবে স্বীকার করেছেন। দেওবন্দী ধারার বিখ্যাত একটি প্রতিষ্ঠান হলো- আল জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম হাটাজারী মাদরাসা, চট্টগ্রাম। উক্ত প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আহলে হাদীস লা-মাযহাবীদের চিন্তা ধারার জবাবে 'সাইফুল মুকাল্লিদিন' নামে একটি কিতাব লেখা হয়েছে। কিতাবটি লিখেছেন হাটাজারী মাদরাসার শিক্ষক ও মুফতি মো: জসিম উদ্দিন সাহেব। উক্ত কিতাবের নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে অভিমত পেশ করেছেন (১) মাওলানা আহমদুল হক সাহেব (শিক্ষক, হাটাজারী মাদরাসা), (২) মাওলানা আহমদ শফি সাহেব (মহাপরিচালক, হাটাজারী মাদরাসা), (৩) মাওলানা রফিকুল হক সাহেব (শিক্ষক, হাটাজারী মাদরাসা)। উক্ত সাইফুল মুকাল্লিদিন বইটিতে লেখা হয়েছে আহলে হাদীস লা-মাযহাবীরা মূলত ওয়াহাবি নামে পরিচিত ছিল। ১৮৭৬ ইংরেজিতে তারা ব্রিটিশ সরকারের কাছে দরখাস্ত করে ওয়াহাবি নাম পরিবর্তন করে আহলে হাদীস নাম ধারণ করেছে। (দেখুন: সাইফুল মুকাল্লিদিন, পৃষ্ঠা:৭৫)

বইটির লিখক এ কথাই প্রমাণ করেছেন লা-মাযহাবীদের যত ভ্রান্ত আমল ও আকীদা রয়েছে সব কয়টি ওয়াহাবীদের আমল ও আকীদা। এই ফেরকাকে গায়রে মুকাল্লিদ বা লা মাযহাবী কেন বলা হয়? এ বিষয়ে উক্ত গ্রন্থে আছে, এই ফেরকার জন্মলগ্ন থেকেই তারা তাকলীদকে শিরক ও বিদআত বলে, তাই তাদেরকে 'গায়র মুকাল্লিদ' নামে অভিহিত করা হয়। পরবর্তীতে জানা গেল এটা একটি নির্বাসিত ফেরকা, যাকে ইসলামকে গঠনের পরিবর্তে ধ্বংসের জন্য তৈরী করা হয়েছে। যেহেতু এরা চার মাযহাব থেকে কোনো এক মাযহাবের অনুসরণ পরিত্যাগ করেছে, তাই মানুষ তাদেরকে লা মাযহাবী নামে আখ্যায়িত করেছে।

এই ফেরকা সম্পর্কে উক্ত গ্রন্থে আছে, ঐ যুগে আরবে ইবনে আব্দুল ওয়াহহাবের দল হত্যা ও ধ্বংসের বাজার গরম করে রেখেছিল। অনেক মাযার ভেঙ্গে দিয়েছিল এবং সৌদি সরকার নবী (সা.)-এর মাজারকেও ভেঙ্গে ফেলার ষড়যন্ত্র করেছিল, কিন্তু তাতে লিপ্ত হয়নি। তারা আইন করেছিল ওয়াহহাবীগণ ব্যতিত অন্য কেউ বায়তুল্লাহর হজ্জ করতে পারবে না। আর উসমানীগণকে হজ্জ থেকে বাধা প্রদান করে। সেই যুগে কয়েক বছর হজ্জব্রত পালনের থেকে অনেক মানুষ মাহরুম হয়। শাম ও আজম এর অনেক মানুষের ভাগ্যে হজ্জ পালন সম্ভব হয়নি। (তরজুমানে ওয়াহহাবী-৩৬)

তারা আরব অধিবাসী বিশেষ করে হারামাইন শরীফাইনের অধিবাসীদেরকে অনেক কষ্ট দিয়েছে। (তরজুমানে ওয়াহহাবী-পৃষ্ঠা:৪০)

লা-মাযহাবীদের অধিকাংশ মাসায়েল ইবনে আব্দুল ওয়াহাব নজদীর মাযহাব মোতাবেক হয়। এই জন্যই তাদেরকে ওয়াহাবী বলা হয়। কিন্তু মৌলভী ফজলে রসূল বাদায়ুনি তার প্রতিদ্বন্দীদের কুখ্যাতির জন্য মুজাহিদগণকে ওয়াহাবি বলা শুরু করেছে। (তরজুমানে ওয়াহাবিয়া-৪৭/৪৪)

মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী 'আশ শিহাবুস সাকিব' কিতাবে লিখেছেন, সুধিগণ! মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব নজদী সর্বপ্রথম আরবের নজদ থেকে ১৩০০ হিজরীতে আবির্ভুত হয়। যেহেতু সে বাতিল চিন্তাধারা এবং ভ্রষ্ট আকীদা পোষণ করত, এজন্য আহলে সুন্নাত ওয়ালা জামাআতের অনুসারীকে হত্যা করে এবং তাদেরকে জোরপূর্বক তার বাতিল চিন্তাধারা সমর্থনের জন্য কষ্ট দিতে থাকে। তাদের মালকে গনিমতের মাল মনে করে। তাদেরকে হত্যা করা সওয়াব ও রহমতের কারণ মনে করে। বিশেষ করে হারামাইনের অধিবাসীকে এবং সাধারণভাবে হেজাযবাসীকে অত্যন্ত কষ্ট দেয়। সালফে সালিহীন এবং তাদের অনুসারী সম্পর্কে অত্যন্ত বেয়াদবী ও অসৌজন্যমূলক শব্দ ব্যবহার করে। অনেক লোককে তাদের এসব আচরণের কারণে মক্কা মদীনা ত্যাগ করতে হয়। তাছাড়া হাজার হাজার মানুষ তাদের বাহিনীর হাতে নিহত হয়। মোটকথা, সে একজন জালিম, বাগী এবং রক্ত পিপাসু ফাসিক ছিল। (আশ-শিহাবুস সাকিব, পৃষ্ঠা:৫৪)

এ আলোচনা থেকে প্রমাণ হয় যে, দেওবন্দী আকাবির উলামায়ে কিরাম ওহাবী ছিলেন না। বরং তারা ওহাবীদের আকীদাকে বাতিল আকীদা বলেছেন।

অপরদিকে বর্তমান ওয়াহাবীদের বড় মাপের আলিমগণের অনেকেই দেওবন্দ ধারাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত বলে গ্রহণ করা তো দূরের কথা বরং উক্ত ধারার বড় বড় আলিমগণের অনেককে কুফুরীর ফাতাওয়া দিয়েছেন। হামুদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ বিন হামুদ আত তুয়াইজিরী (১৩৩৪-১৪১৩ হিজরী) আরব দেশীয় একজন প্রখ্যাত ওয়াহাবী আলিম। তিনি 'আল কাউলুল বালিগ ফিত তাহযিরি আন জামায়াতিত তাবলীগ' নামে একটি কিতাব লিখেছেন। উক্ত কিতাবে হুসাইন আহমদ মাদানী, আশরাফ আলী থানভী, শায়খুল হাদীস জাকারিয়া সাহেব, শাইখুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান, রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী প্রমুখ দেওবন্দের আকাবিরকে কাফির মুশরিক ইত্যাদি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন (নাউযুবিল্লাহ)। এত কিছুর পরও অতি উৎসাহী কিছু দেওবন্দী মুহাম্মদ ইবনে আবুল ওয়াহাব নজদীকে মহান সংস্কারক ও নিজেদেরকে তার অনুসারী বলার রহস্য কি তা বোধগম্য নয়। আল্লাহই বেশি জানেন। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, আশ শিহাবুস সাকিব, আল মুহান্নাদ আলাল মুফান্নাদ, সাইফুল মুকাল্লিদীন, আল কাওলুল বালীগ ফিত্ তাহযীর আন জামাআতিত তাবলীগ দ্রষ্টব্য)

প্রশ্নে উল্লেখিত ম্যাগাজিনে দেওবন্দ বিরোধীদের সকলকে ঢালাওভাবে কবর বা মাজারপূজারী বলে আখ্যায়ন অসত্য ও অযৌক্তিক। আকীদার মূল বিষয় বহির্ভূত শাখাগত বহু মাসআলায় দেওবন্দপন্থীদের সাথে অন্যান্য হক্কানী সুন্নী উলামা মাশায়িখের মতবিরোধ থাকলেও তাদের নিয়ে অসত্য মন্তব্য করা উচিত নয়। মাশায়িখে রামপুর, মাশায়িখে ফুরফুরা, মাশায়িখে জৌনপুরও তাদের শাখা হিসেবে সুপরিচিত। ছারছীনা, ফুলতলী, সোনাকান্দাসহ এ ধারার সকলেই প্রকৃত শিরক ও বিদআতবিরোধী অবস্থানে অতি কঠোর ও আপোষহীন। বিশেষত: কবর কিংবা মাজারকে কেন্দ্র করে শরীআতবিরোধী সকল কার্যকলাপের বিপক্ষে তাদের অবস্থানের বিষয় অত্যন্ত সুস্পষ্ট, যা কারো অজানা নয়। তাই উপরে বর্ণিত মন্তব্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক, যা মুসলিম উম্মাহর মধ্যে অযথা বিভেদ সৃষ্টির মতো অপরিণামদর্শী ইন্দন যোগানো বৈ কি হতে পারে?

মো. রকিব আলী

ভাগমতপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার

আমাদের সমাজে কোনো কোনো এলাকায় মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে মৃত্যুর দশম দিবসে ১০ জোড়া রুটি বানিয়ে কুলায় করে নিয়ে ১০ জন এতীমের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়, যা 'দশা' নামে পালন করা হয় এবং এমন করাকে কোনো কোনো এলাকায় অপরিহার্য মনে করা হয়। এটি কি শরীয়তসম্মত? শরীয়তসম্মত না হলে এ সম্পর্কে আমাদের করণীয় কি? জানতে চাই।

জবাব: মৃতের রূহের মাগফিরাত ও সওয়াব রেসানীর ক্ষেত্রে যে কোনো নেক কাজ করে যে কোনো দিন মায়্যিতের উদ্দেশ্যে সওয়াব পৌছানোর বৈধতা শরীয়ত স্বীকৃত। তবে বর্ণিত 'দশা' নামে পালিত যে সকল সুনির্দিষ্ট নিয়ম সম্মিলিত রীতি কোনো কোনো এলাকায় হচ্ছে এর সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। এখানে এমন কতিপয় বিষয়কে আবশ্যকীয় মনে করা হচ্ছে যেগুলো আবশ্যক হওয়ার কোনো দলীল সাব্যস্ত নেই। যথা: ১) মৃত্যুর দশম দিনে হওয়া আবশ্যক মনে করা ২) রুটি ব্যতীত অন্য কিছু দেওয়া যাবে না মনে করা ৩) এতীম ছাড়া অন্য কাউকে দেওয়া যাবে না মনে করা। এসকল অনাবশ্যকীয় বিষয় আবশ্যক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে এটা বদ রুসুমের আওতাভুক্ত ও পরিত্যাজ্য। এটাকে জরুরী করণীয় মনে করা বিদআতে সায়্যিআহ (নিকৃষ্ট বিদআত)। মনীষীদের কেউ কেউ একে হিন্দুদের 'দশা' এর আদলে তাদের সংস্কৃতি চর্চার বিকল্প ধারা হিসেবে মুসলিম সমাজে প্রবেশ হওয়া বিজাতীয় রুসুমাতের মধ্যে গণ্য করেছেন। তাই এ থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। (ইসলাহুর রুসূম, জাওয়াহিরুল ফিকহ দ্রষ্টব্য)

হাফিয মো. নজরুল ইসলাম

কুইন্স, নিউইয়র্ক, আমেরিকা

বর্তমানে মুসলমান ছেলেদের অনেকে থ্রি কোয়ার্টার প্যান্ট পরিধান করতে অভ্যস্ত এমনকি এগুলো পরিধান করে তাদের কেউ কেউ নামায পড়তেও দ্বিধাবোধ করে না। উল্লেখ্য যে, প্যান্টগুলো এমন যেগুলো পরিধান করলে কোনোমতে হাঁটু ঢেকে যায়। এগুলো পরিধান করে নামায আদায়ের বিধান কি? জানতে চাই।

জবাব: প্রশ্নে উল্লেখিত থ্রী কোয়ার্টার প্যান্ট পরিধান বিজাতীয় অনুসরণ-অনুকরণের অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে এমন প্যান্ট মুসলমানের জন্যে নামায কিংবা নামাযের বাইরে সর্বাবস্থায় পরিধান বর্জনীয়। নামাযে পুরুষের ক্ষেত্রে নাভী থেকে নিয়ে উভয় হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে যায় এমন পোষাকে নামায আদায় শুদ্ধ হবে, পুনর্বার পড়তে হবে না। আর এমন পোষাকে নামায আদায় করা মাকরূহ যা পরিধান করে বন্ধু-বান্ধব কিংবা সাধারণ লোকের সম্মুখে যাওয়া লজ্জাজনক মনে করা হয়। সুতরাং বর্ণিত থ্রি কোয়াটার প্যান্ট পরিধান করে নামায আদায় মাকরূহ হবে। উল্লেখ্য যে, যার নিকট এমন পোষাক ছাড়া অন্য পোষাক নেই তার কথা ভিন্ন। সর্বাবস্থায় নামায আদায়ে সুন্দর ও সুন্নাহসম্মত পোষাক পরিধান করে নামায আদায় করা উচিত। পবিত্র কুরআন মাজীদে মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ (الاعراف:١٣)

-"হে বনী আদম! তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় সাজসজ্জা পরিধান করে নাও।" (সূরা আরাফ: ৩১, তাফসীরে মায়ারিফুল কুরআন দ্রষ্টব্য)

আফিয়াউল হুসনা
গোলাপগঞ্জ, সিলেট

বর্তমানে আমরা দেখতে পাই কোনো মহিলার স্বামী মারা গেলে স্ত্রীকে সাদা কাপড় পরতে হয় এবং স্বামীর মৃত্যুর চল্লিশ দিন পর্যন্ত স্ত্রীর ঘর থেকে বের হওয়া দুষণীয় মনে করা হয়। এমনকি কেউ কেউ আপন ভাইয়ের সাথেও কথা বলা নিষেধ বলে থাকেন। এ সম্পর্কে সঠিক মাসআলা দলীলসহ সবিস্তারে জানতে চাই।

জবাব: বিধবা নারীর ইদ্দত ও শোক পালনের বিষয় শরীয়তে সাব্যস্ত বিষয়। কোনো মহিলার স্বামী মৃত্যুবরণ করলে মৃত্যুর দিন থেকে নিয়ে চার মাস দশ দিন তথা ১৩০ দিন পর্যন্ত উক্ত মহিলা কারো সাথ বিবাহ বসতে পারবে না, যদি সে গর্ভধারিণী না হয়ে থাকে। আর গর্ভধারিণী হলে সন্তান ভুমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত তাকে অনুরূপ ইদ্দত পালন করতে হবে। আর তৎসঙ্গে হিদাদ তথা শোক পালনের নীতিমালা হিসেবে নিম্ন বর্ণিত বিষয়াদি থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য। যথা:

১। শরীর ও পরিধেয় বস্ত্রে সুগন্ধি ব্যবহার
২। সুন্দর রঙ্গীন চমকানো পোষাক বা কাপড় পরিধান করা
৩। স্বর্ণ, রৌপ্য, মনি-মুক্তা কিংবা এরূপ মূল্যবান পদার্থের তৈরি গহনা বা অলংকারাদি পরিধান
৪। মেহেদীর বা অন্য যে কোনো খেযাব ব্যবহার
৫। সুরমা ব্যবহার
৬। স্বামীর গৃহ থেকে একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত বের হওয়া।

উপরে বর্ণিত বিষয়াবলি বিধবা নারীগণ ইদ্দত পালনরত অবস্থায় পরিহার করে চলতে রাসূলুল্লাহ (সা.) নির্দেশনা দিয়েছেন। একান্ত প্রয়োজনে বাইরে যাওয়া আবশ্যক হলে যেতে পারবেন। বিধবা নারী মাহরামের সাথে কথা বলতে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। একান্ত প্রয়োজনে পর্দার আড়াল থেকে বেগানা পুরুষের সাথে কথা বলা অন্যান্য নারীদের মতো বিধবার জন্যেও জায়িয। সুতরাং আপন ভাইয়ের সাথে কথা বলতে কোনো বাধা নেই। (বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, বাহরুর রায়িক, তাবয়িনুল হাকাইক)

আর প্রশ্নে উল্লেখিত চল্লিশ দিনের সময় সীমা (বিধবার ইদ্দতের ক্ষেত্রে) আদৌ সঠিক নয়।

জেসমিন বেগম
মিশিগান, আমেরিকা

এক ছেলে বাংলাদেশ থেকে আমেরিকায় অবস্থানকারী মেয়েকে শরীয়তের নিয়মানুযায়ী ফোনে বিবাহ করেছে। বিবাহের মোহরানা ৩০ হাজার ডলার ধার্য করা হয়েছিল। মেয়ে দেশে যেতে পারেনি (অর্থাৎ বাসর হয়নি) এমতাবস্থায় ছেলে মৃত্যুবরণ করেছে। ছেলে মারা যাওয়ার কয়েক মাস পর উক্ত মেয়ের অবিভাবক মেয়ের মোহরানা দাবি করছে। এমতাবস্থায় মেয়ে কি কোনো মোহরানা পাবে? জানতে চাই।

জবাব: বিবাহের আকদ বৈধভাবে সম্পাদিত হলে অর্থাৎ বিবাহ শুদ্ধ হলে উক্ত স্ত্রী তার স্বামীর নিকট দেন মোহরের হকদার হবে। এ ক্ষেত্রে নির্জনবাসের পূর্বে স্বামীর মৃত্যু হলে কিংবা স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিলে শরীয়তের নিয়মানুযায়ী স্ত্রী নির্ধারিত মোহরের অর্ধেক পাবে, অর্থাৎ ১৫ হাজার ডলার পাবে। আর চাইলে স্ত্রী কিংবা তার অভিভাবক তা মাফ করতে পারে।

(তথ্যসূত্র: রদ্দুল মুহতার, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১০৪; আল বাহরুর রাইক, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৫৪)

মো: রায়হান চৌধুরী
রিয়াদ, সৌদী আরব

মানুষ বা কোনো প্রাণীর ভাস্কর্য নির্মাণ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ কি? বিস্তারিত জানতে চাই।

জবাব: মানুষ কিংবা যে কোনো প্রাণীর পূর্ণ দেহ বিশিষ্ট ভাস্কর্য নির্মাণ, অঙ্কন, ক্রয়-বিক্রয় কিংবা সংরক্ষণ এবং এমন পেশার উপার্জন ফুকাহায়ে কিরামের সর্বসম্মত ও গ্রহণযোগ্য অভিমত অনুসারে হারাম বা নিষিদ্ধ। চাই তা সৌন্দর্য হিসেবে হোক কিংবা সম্মান প্রদর্শনার্থে। উক্ত রায় প্রদানে ফুকাহায়ে কিরাম নিম্ন বর্ণিত কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট ভাষ্য পেশ করেছেন।

পবিত্র কুরআন মাজীদে ইরশাদ হচ্ছে-

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (الحج:٣٠)

-তোমরা মূর্তিদের অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাক এবং মিথ্যা কথা পরিহার কর। (সূরা হজ্জ: ৩০)

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ (الانبياء:٢٥)

-যখন তিনি তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বললেন, "এই মূর্তিগুলো কী, যাদের তোমরা পূজারী হয়ে বসে আছ। (সূরা আম্বিয়া: ৫২)

অন্যত্র বলা হচ্ছে-

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا (نوح:٣٢)

-তারা বলল, তোমরা তোমাদের উপাস্যদের ত্যাগ করো না, আর ত্যাগ করো না ওয়াদ্দ, সুয়াআ, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নাসরকে। (সূরা নূহ: ২৩)

অন্য আয়াতে এসেছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة:٩٠)

-হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, প্রতিমা, ভাগ্য নির্ণয়কারী শরসমূহ শয়তানের অপবিত্র কাজ। অতএব, এগুলো থেকে বেঁচে

থাক, যাতে তোমরা সফলকাম হও। (সূরা মায়িদাহ; আয়াত: ৯০) যেমন হাদীস শরীফে এসেছে-

عن أبي جحيفة، قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا وموكله، ونهى عن ثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن المصورين– ٨٤٣٥

-হযরত আবূ জুহাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা.) দেহের চামড়া ক্ষত (কর্তন) করে উল্কি অঙ্কনকারী, এর নির্দেশকারী, সুদ গ্রহীতা এবং সুদ দাতাকে অভিসম্পাত করেছেন। আর কুকুরের মূল্য ও বেশ্যার উপার্জন থেকে নিষেধ করেছেন। আর প্রাণীর চিত্রাঙ্কনকারীর উপর অভিসম্পাত করেছেন। (সহীহ বুখারী: ৫৩৪৮)

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يعذب المصورين بما صوروا– ٠٠٧٩

-হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা প্রাণীর চিত্র অঙ্কন করার কারণে চিত্রাঙ্কনকারীকে শাস্তি প্রদান করবেন। (সুনানে নাসায়ী: ৯৭০০)

عن قتادة قال: كنت عند ابن عباس، وهم يسألونه، ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى سئل، فقال: سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ– (٣٦٩٥)

-হযরত কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর নিকট ছিলাম আর লোকেরা এমতাবস্থায় তাকে প্রশ্ন করছিল। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কথা উল্লেখ করতেন না যদি না তাঁকে জিজ্ঞেস করতেন। তাই তাদের জবাবে তিনি বললেন, আমি মুহাম্মদ (সা.) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়ার জীবনে কোনো প্রাণির আকৃতি অঙ্কন করবে বা ভাস্কর্য নির্মাণ করবে কিয়ামত দিবসে এতে রূহ ফুঁকে দেওয়ার জন্য বাধ্য করা হবে অথচ সে তা ফুঁকে দিতে পারবে না। (সহীহ বুখারী: ৫৯৬৩)

عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفس تعذبه في جهنم" فإن كنت لا بد فاعلا، فاجعل الشجر وما لا نفس له– (احمد: ٩٠٨٢، مسلم:٠١١٢)

-হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি সকল ছবি বা ভাস্কর্য নির্মাণকারী জাহান্নামে যাবে। সে যত ছবি বা ভাস্কর্য বানিয়েছিল প্রতিটির জন্য তাকে একটি করে আত্মা দিয়ে জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবে। (তিনি প্রশ্নকারীকে বললেন) যদি তোমাকে ছবি বা ভাস্কর্য একান্ত বানাতে হয় তাহলে গাছের বা যার কোনো প্রাণ নেই এমন কিছুর ছবি বা প্রতিকৃতি তৈরি করতে পারবে। (সহীহ মুসলিম: ২১১০, মুসনাদে আহমদ: ২৮০৯)

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت: فجعلناه وسادة أو وسادتين (٤٥٩٥ مسلم: ٧٠١٢)

-হযরত আয়শা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) কোনো এক সফর থেকে আগমন করলেন। আর আমি কয়েকটি প্রাণীর ছবি অঙ্কিত একখানা কাপড় পর্দা হিসেবে ঘরের মেঝে ঝুলিয়েছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা.) তা দেখামাত্র খুলে ফেললেন এবং বললেন, কিয়ামত দিবসে সবচেয়ে কঠিন শাস্তিপ্রাপ্ত তারা হবে যারা আল্লাহর সৃষ্টির সাদৃশ্য বানিয়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। তিনি (আয়শা রা.) বলেন, অতঃপর আমরা এর দ্বারা একটি বা দুটি বালিশ বানালাম। (সহীহ বুখারী: ৫৯৫৪, সহীহ মুসলিম: ২১০৭) এ প্রসঙ্গে নিষিদ্ধতার আরো বহু হাদীসের বর্ণনা রয়েছে, যেগুলোর দ্বারা যে কোনো প্রাণীর পূর্ণ ছবি বা ভাস্কর্য নির্মাণ শরীয়তের বিধানে হারাম সাব্যস্ত হয়েছে। কোনো কোনো মনীষী (ইসলাম ব্যতীত) অন্যান্য নবীর শরীয়তে তা বৈধ ছিল বলে অভিমত পোষণ করলেও সে অভিমত উপরিবর্ণিত দলীলের ভিত্তিতে পরিত্যাজ্য। এ সম্পর্কে তাফসীরে মাযহারী প্রণেতা কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) উপরে বর্ণিত বহু হাদীস উল্লেখ পূর্বক রায় দিয়ে বলেছেন,

وسياق هذه الأحاديث يدل على ان حرمة التصوير غير مختص بهذه الامة

-এ সকল হাদীসের দৃষ্টিভঙ্গি একতার প্রমাণ বহন করে যে, ছবি বা ভাস্কর্য নির্মাণ হারাম হওয়া কেবল এ উম্মতেরই বিশেষত্ব নয় (বরং পূর্বেকার সকল ধর্মেও তা হারাম ছিল। (তাফসীরে মাযহারী, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৬)

শরহে মিশকাত গ্রন্থকার আল্লামা তীবী (র.) লিখেছেন,

"هذا محمول على من صور الأصنام لتعبد، فله أشد عذاب؛ لأنه كافر. وقيل: هذا فيمن قصد المضاهاة بخلق الله، واعتقد ذلك وهو أيضا كافر، وعذابه أشد. ومن لم يقصدهما فهو فاسق لا يكفر كسائر المعاصي. وأما الشجر ونحوه مما لا روح فيه فلا يحرم صنعته ولا التكسب به. وهذا مذهب العلماء الا مجاهدا"

উপরি বর্ণিত শেষোক্ত হাদীসের ভাষ্যের প্রয়োগ এ অর্থে হবে যে, পূজার উদ্দেশ্যে যে মূর্তি নির্মাণ করবে তার সবচেয়ে কঠিন শাস্তি হবে, কেননা সে কাফির। আর কেউ কেউ বলেছেন কঠিন শাস্তি তারও হবে যে আল্লাহর প্রতিদ্বন্দ্বিতার মানসে সাদৃশ্যপূর্ণ কিছু বানাল বা এর মনোভাব পোষণ করল সে ব্যক্তিও কাফির। আর যে পূজা কিংবা আল্লাহর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্দেশ্য ব্যতীত এমন কিছু বানাবে সে অন্যান্য কবীরাহ গোনাহকারীর ন্যায় ফাসিক হবে, তবে কাফির নয়। আর গাছ কিংবা অনুরূপ যে সকল জিনিসের মধ্যে প্রাণ নেই সেগুলো নির্মাণ করা বা এর দ্বারা উপার্জন করা হারাম নয়। এটি ইমাম মুজাহিদ (র.) ব্যতীত সকল আলিমগণের সম্মিলিত অভিমত। (শরহুল মিশকাত লিত্তীবী; ৯ম খণ্ড)

অভ্যন্তরীণ

পদ্মা সেতু দৃশ্যমান

অনেক বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে পূর্ণ অবয়ব পেয়েছে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের স্বপ্নের 'পদ্মা সেতু'। যুক্ত হয়েছে পদ্মার দুই তীর। ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার এই সেতুই রাজধানীর সঙ্গে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ২১ জেলাকে সরাসরি সড়ক পথে যুক্ত করবে। গত ১০ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার বেলা ১২টা ২ মিনিটে পদ্মা সেতুর সর্বশেষ স্প্যানটি বসানোর ফলে সেতুর মূল কাঠামোর পুরোটা দৃশ্যমান হয়েছে। ২০২২ সালের জুন মাসের মধ্যে যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া সম্ভব হতে পারে। ২২ মিটার প্রশস্ত এই সেতুতে চারটি লেনে যানবাহন চলতে পারবে। সেতুর পেটের ভেতর দিয়ে এক লাইনে চলবে মিটারগেজ ও ব্রডগেজ এই দুই ধরনের ট্রেন। ৩০ হাজার ১৯৩ কোটি টাকার এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে মোংলা বন্দর ও বেনাপোল স্থলবন্দরের সঙ্গে রাজধানী এবং বন্দরনগরী চট্টগ্রামের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হবে।

গুচ্ছ পদ্ধতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা

চলতি বছরে বাংলাদেশের ১৯টি সাধারণ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে গুচ্ছ পদ্ধতিতে একযোগে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা এবং মানবিক এই তিনটি আলাদা বিভাগে তিন দিন সবকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে একযোগে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এমসিকিউ অর্থাৎ উত্তর বেছে নেওয়ার পদ্ধতিতে প্রতি বিষয়ে মোট নম্বর থাকবে ১০০। গুচ্ছ পদ্ধতিতে আবেদন করতে হলে বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের এসএসসি ও এইচএসসি মিলে ৭, ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের জন্য ৬.৫ এবং মানবিক বিভাগের জন্য ৬ থাকতে হবে। এক্ষেত্রে এসএসসি এবং এইচএসসি এই দুই পরীক্ষার প্রত্যেকটিতে সিজিপিএ স্কোর কমপক্ষে ৩ থাকতে হবে। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ আরও কয়েকটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় আলাদাভাবে ভর্তি পরীক্ষা নেবে।

ভাসানচরে রোহিঙ্গা পরিবার

রোহিঙ্গাদের প্রথম একটি দল ইতোমধ্যে নোয়াখালীর হাতিয়ার ভাসানচরে পৌঁছেছে। গত ৩ ডিসেম্বর নারী-পুরুষ ও শিশু মিলিয়ে মোট ১ হাজার ৬৪২ জনের একটি দল ভাসানচরে পৌঁছান। সেখানে তাদের জন্য রয়েছে উন্নত বাড়ি, বিদ্যুৎ, স্কুল, বিশুদ্ধ পানি, টেলিযোগাযোগ, কৃষি খামার, পাকা সড়ক, উন্নত স্যানিটেশন, বেড়িবাঁধ, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, বিনোদনের ব্যবস্থা, হাসপাতাল, জীবিকা নির্বাহের সুযোগসহ নানা সুবিধা।

করোনা শনাক্ত প্রায় ৮ কোটি। মৃত্যু সাড়ে ১৭ লাখ

বিশ্বে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত শনাক্ত রোগীর সংখ্যা ৭ কোটি ৯৮ লাখ ছাড়িয়েছে। মৃত মানুষের সংখ্যা ১৭ লাখ ৫১ হাজারের বেশি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার করোনা ডাটাবেস ওয়ার্ল্ডোমিটারের গত ২৫ ডিসেম্বরের তথ্যমতে, এখন পর্যন্ত বিশ্বে করোনা থেকে সেরে ওঠা মানুষের সংখ্যা ৫ কোটি ৬২ লাখ ৭৯ হাজার। করোনায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ যুক্তরাষ্ট্র। দেশটিতে মারা গেছেন ৩ লাখ ৩১ হাজার জন। দ্বিতীয় অবস্থানে ভারত। শনাক্ত মানুষের সংখ্যা এক কোটি। মারা গেছেন ১ লাখ ৪৭ হাজার জন। বাংলাদেশের অবস্থান ২৭তম। বাংলাদেশে শনাক্তের সংখ্যা পাঁচ লাখ। মৃত্যু হয়েছে ৭ হাজারের বেশি। প্রতিদিন গড়ে সাড়ে ১২ হাজার নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে। রোগী শনাক্তের হার ১৬.৩১ শতাংশ।

আন্তর্জাতিক

যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় সাইবার হামলা রাশিয়ার!

যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সরকারি ও গুরুত্বপূর্ণ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সাইবার হামলা চালানো হয়েছে। গত ১৭ ডিসেম্বর মার্কিন জ্বালানি দফতরও হামলার কথা নিশ্চিত করেছে। এই হামলাকে 'যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় হামলা' বলেও উল্লেখ করেছে প্রতিষ্ঠানটি। এই হামলার জন্য রাশিয়াকে দায়ী করেছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, রাশিয়া নয়, যুক্তরাষ্ট্রে সাইবার হামলার পেছনে রয়েছে চীন। হামলার পেছনে কে দায়ী, অনুসন্ধান অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই।

রোহিঙ্গা গণহত্যা মামলায় সমর্থন দিতে শতাধিক ব্রিটিশ এমপির আহবান

রোহিঙ্গা গণহত্যা নিয়ে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (আইসিজে) গাম্বিয়ার করা মামলায় সমর্থন দিতে যুক্তরাজ্যের সরকারকে হস্তক্ষেপ করার আহবান জানিয়েছেন দেশটির শতাধিক এমপি। যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ বিষয়ক মন্ত্রী ডমিনিক রাবের জারি করা একটি চিঠিতে বলা হয়েছে, কেবল ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে ও আন্তর্জাতিক আইনকে সমর্থন করতেই নয়, মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর দ্বারা আরও আন্তর্জাতিক অপরাধ রোধেও দায়মুক্তির অবসান জরুরি। রোহিঙ্গাদের অধিকার সম্পর্কিত সর্বদলীয় সংসদীয় গ্রুপের কো-চেয়ার রুশনারা আলী ও জেরেমি হান্ট যুক্তরাজ্যের ১০৪ জন সংসদ সদস্যের পক্ষে এই চিঠিতে স্বাক্ষর করেন। কানাডা ও নেদারল্যান্ডস ইতোমধ্যে এ মামলায় হস্তক্ষেপ করেছে।

ভারতের জাতীয় সঙ্গীত পরিবর্তনের দাবি

ভারতের জাতীয় সঙ্গীত পরিবর্তনের দাবি জানিয়েছেন বিজেপি নেতা ও রাজ্যসভার সংসদ সদস্য সুব্রামনিয়ন স্বামী। তিনি এক টুইট বার্তায় লেখেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত 'জন গন মন' গানটির মূল সংস্করণের পরিবর্তে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আমির সর্বাধিনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর গৃহীত সংস্করণটি জাতীয় সঙ্গীত করতে হবে। এটি অনেকাংশেই দেশাত্মবোধক ও নির্ভুল। এর আগেও রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন লেখা নিয়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) এর বিভিন্ন মহলে নানা সময়ে আপত্তি উঠেছিল। ১৯৪৯ সালে ভারতের প্রথম প্রেসিডেন্ট রাজেন্দ্র প্রাসাদ বলেছিলেন, জাতীয় সঙ্গীতের শব্দ পরিবর্তন বা সংশোধন করা যেতে পারে।

পরওয়ানা ডেস্ক:

শিশুরা সহজে ভাষা রপ্ত করতে পারে

একটু খেয়াল করলে দেখবেন, শিশুরা যত সহজে নতুন একটি ভাষা রপ্ত করতে পারে বড়রা তত সহজে পারে না। নতুন অভিবাসী পরিবারে দেখা যায়, শিশুরা বড়দের চেয়ে অনেক সহজেই নতুন দেশের নতুন ভাষা আয়ত্ত করে ফেলেছে। তাদের মা-বাবার পক্ষেও সেটা সম্ভব হয় না। কিন্তু কেন এমন হয়?

আমাদের বেড়ে ওঠার সাথে সাথে আমাদের মস্তিষ্ক নানা দিক থেকে বদলাতে থাকে। গবেষকরা বলছেন, এর মধ্যে শব্দ নিয়ে কাজ করার বিষয়টিও রয়েছে। শিশু-কিশোররা ভাষা বুঝতে কিংবা শব্দ ব্যবহার করতে তাদের ব্রেইনের উভয় পার্শ্ব ব্যবহার করে। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর এই কাজের জন্য আমরা কেবল ব্রেইনের বাম দিকটাকে ব্যবহার করি। ভাষা প্রক্রিয়াকরণে ব্রেইনের উভয় অংশ ব্যবহার থেকে এক অংশ ব্যবহার করতে শুরু করি। সেটা কিন্তু একসাথে হয় না, বরং ধীরে ধীরে হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়ার শুরু হয় আমরা যখন কথা বলতে শিখি তখন থেকে। পুরোপুরি এক পাশের উপর নির্ভর করতে শুরু করি প্রায় ১৯ বছরের দিকে।

নতুন এই গবেষণার সাথে জড়িত বিজ্ঞানীদের একজন হলেন ডক্টর উইলিয়াম গেইলার্ড। তিনি ওয়াশিংটন ডিসির জাতীয় শিশু হাসপাতালের নিউরোলজিস্ট। তার মতে, নতুন এ আবিষ্কার মানুষের ব্রেইন কীভাবে কাজ করে, কীভাবে বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে খাপ খাইয়ে নেয়, তা বুঝতে সাহায্য করবে। ভবিষ্যতে শিশু ও বয়স্ক উভয় ধরনের রোগীর চিকিৎসার ক্ষেত্রে এ গবেষণা সহায়তা করবে। গবেষক দল তাদের গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করেন প্রসিডিংস অব দ্য ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস (পিএনএএস) এ।

হাতেলেখা ক্লাস নোট অধিক কার্যকরী

ক্লাস নোট হাতে লিখলে মনে রাখার ক্ষেত্রে অধিক সহজ। শিক্ষা অর্জনে ডিজিটাল ডিভাইসে টাইপিং এর তুলনায় সহায়ক হতে পারে। আজকাল শিক্ষাক্ষেত্রে কম্পিউটার প্রযুক্তি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু কলম কিংবা পেনসিল ব্যবহার করলে কীবোর্ড ব্যবহারের তুলনায় ব্রেইনের বেশি অংশ সক্রিয়ভাবে কাজ করে। নতুন এক গবেষণায় এরকমই দাবি করা হচ্ছে।

ডিজিটাল ডিভাইসের প্রসারের ফলে এখন শিশুদের হাতের-লেখা শেখার বিকল্প হিসেবে অনেকে কীবোর্ডের ব্যবহারের কথা বলছেন। তাদের মতে, শিশুদের জন্য হাতে কলমে লেখার চেয়ে টাইপিং অনেক সহজ হবে। এমনকি নরওয়ের কিছু স্কুল ইতোমধ্যে পুরোপুরি ডিজিটাল স্কুলে পরিণত হয়েছে। সেসব স্কুলে এখন কাগজে কলমে লেখা শেখানো হয় না। গবেষকরা বলছেন, এটি খুব ভালো পদ্ধতি নয়। গবেষক দলের প্রধান 'অদ্রে ভ্যান দের মির' মনে করেন, শিশুদেরকে ঠিকটাক মতো হাতে লিখতে শেখানো উচিত। পাশাপাশি কীবোর্ডের ব্যবহারও শেখানো যেতে পারে।

নিউরোমনোবিজ্ঞানী 'ভেন দের মির' মানুষের ব্রেইনের কার্যক্রম নিয়ে কাজ করেন। তিনি বর্তমানে নরওয়েজিয়ান ইউনিভার্সিটিদদদ অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে কর্মরত আছেন।

তার নতুন গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, কলম কিংবা কলমের মতো ডিজিটাল স্টাইলাস কীবোর্ডের তুলনায় ব্রেইনের বেশি অংশকে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়। কারণ লেখার ক্ষেত্রে অনেকগুলো কাজ এক সাথে করতে হয়। প্রতিটি বর্ণ টাইপ করার ক্ষেত্রে একই রকম কাজ করতে হয়। বিপরীতে প্রতিটি বর্ণ লেখার সময় সে বর্ণের আকার প্রথমে কল্পনা করতে হয়। তারপর আমরা সে আকারটি ঠিক মতো লিখতে পারছি কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য চোখ ব্যবহার করে থাকি। ভিন্ন ভিন্ন আকারের বর্ণ আঁকতে আমরা কলম কিংবা পেনসিল সচেতনভাবে নিয়ন্ত্রণ করি। সেজন্য হাতকে ব্যবহার করতে হয় । এই প্রতিটি কাজের জন্য ব্রেইনের বিভিন্ন অংশ সক্রিয়ভাবে ব্যবহৃত হয়। এ প্রক্রিয়া অনুসরণের মাধ্যমে 'ব্রেইন কোন কিছু শিখার জন্য উন্মুক্ত হয়' এমনটাই দাবি গবেষক দলের। তাই শুধুমাত্র ডিজিটাল ফর্মে টাইপ করা শিখলে সেটা বরং ক্ষতিকরই হতে পারে।

লকডাউন সত্ত্বেও রেকর্ড পরিমাণ গ্রিনহাউজ গ্যাস, জাতিসংঘের হুশিয়ারি

করোনার লকডাউন অন্তত কয়েক ধরনের দূষণ সাময়িকভাবে হলেও হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছে বলেই মনে করা হয়। তবে জাতিসংঘের বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার (ডব্লিউএমও) নতুন প্রতিবেদন অনুসারে, সার্বিক পরিস্থিতি এখনও মারাত্মক ভয়াবহ। ডব্লিউএমও বলছে, ২০২০ সালে বৈশ্বিক কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমণ কিছুটা কমেছে, তবে এটি কার্বন ডাই-অক্সাইডের বায়ুমণ্ডলীয় লেভেলকে অন্যান্য বছরের তুলনায় খুব একটা ভিন্ন প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়নি। ২০১৯ সালে কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রতি মিলিয়নে ৪১০ পার্টে পৌঁছেছিল। ২০২০ সালে এ সংখ্যা আরো বেশি হবে বলে ধারণা করছেন বিজ্ঞানীরা। বৈশ্বিক মহামারী অন্তত একটি সুখবর নিয়ে আসবে বলে আমরা যে আশা করেছিলাম, সে আশা গুড়ে বালি দিয়ে এ বছরও গ্রিন হাউজ গ্যাস তাই ভয়ঙ্কর পর্যায়েই থাকছে।

২০২০ সালে লকডাউনের কারণে বায়ুমণ্ডলে তুলনামূলক কম কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমণ হলেও সেটা খুব দীর্ঘ একটা প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়নি। ফলে বায়ুমণ্ডলে এ বছরও রেকর্ড পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইডের উপস্থিতি লক্ষণীয়। ডব্লিউএমওর ভাষ্যমতে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে এতো বেশি কার্বন ডাই-অক্সাইডের অভিজ্ঞতা হয়েছিল আজ থেকে প্রায় ৩-৫ মিলিয়ন বছর পূর্বে। সে সময় তাপমাত্রা ছিল এখনকার তুলনায় ২-৩° সেলসিয়াস বেশি গরম, সমুদ্র স্তর ছিল এখনকার তুলনায় ১০-২০ মিটার উচু। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে সময়ের পরিস্থিতি এতটা ভয়ঙ্কর ছিল না। কারণ তখন তো পৃথিবীতে ৭৭০ কোটি বাসিন্দা ছিল না।

জানার আছে অনেক কিছু

হারানো মসজিদ

লালমনিরহাট জেলার 'হারানো মসজিদ' দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম মসজিদ। জেলা সদরের পঞ্চগ্রাম ইউনিয়নের রামদাস মৌজায় মসজিদটি অবস্থিত। ১৯৮৭ সালে স্থানীয় জনগণ ঝোপ পরিষ্কার করতে মসজিদটির ভিত আবিষ্কার করেন। সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানতে পেরে গবেষণায় এগিয়ে আসেন টাইগার ট্যুরিজমের উপদেষ্টা টিম স্টিল। তিনি মসজিদটির ধ্বংসাবশেষ নিয়ে বৃহৎ পরিসরে গবেষণা করেন। তার ধারণা, উমাইয়া খিলাফতকালে সাহাবী আবূ আক্কাস (রা.) চীনের উদ্দেশ্যে সফরকালে সমুদ্রপথে এ স্থানে আসেন এবং মসজিদটি নির্মাণ করেন। মসজিদের ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রাপ্ত কালিমা খচিত শিলালিপির খোদাই থেকে জানা যায়, হিজরি ৬৯ সালে এটি নির্মিত হয়। যা ছিল ২১ ফুট চওড়া এবং ১০ ফুট লম্বা। রহস্যময় এ মসজিদটি পুনর্নির্মাণ করে নাম রাখা হয়েছে 'সাহাবায়ে কেরাম মসজিদ'। মসজিদের ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রাপ্ত ৬", ৬", ২" আকারের শিলালিপিটি বর্তমানে রংপুরের তাজহাট জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

মৌমাছি

- আল কুরআনের সূরা নাহলের ১২৮ নং আয়াত থেকে সর্বপ্রথম মৌমাছির জীবনচক্র সম্পর্কে বিজ্ঞানী স্টার্চবার্গার ধারণা লাভ করেন।
- প্রতি ঘণ্টায় একটি মৌমাছি অন্তত ৮ কিলোমিটার উড়তে পারে।
- ৫০০ গ্রাম মধু তৈরিতে মৌমাছিকে ২০ লাখবার ফুলের কাছে যেতে হয়।
- কোনো শ্রমিক মৌমাছি কোনো নাপাক স্থানে বসলে পাহারাদার মৌ সেনারা তাকে মেরে ফেলে।
- একটি শ্রমিক মৌমাছি সারা জীবনে এক চা চামচ মধু তৈরি করতে পারে।
- একটি ছোট মৌচাকে অন্তত ৬০০০০ মৌমাছি থাকে।
- মৌচাক থেকে সংগৃহীত মধু কখনো পচে না।
- মাছির পাখা দুটি থাকলেও মৌমাছির পাখা চারটি।
- পুরো পৃথিবী ভ্রমণ করতে হলে একটি মৌমাছির মাত্র দুচামচ মধুর প্রয়োজন হবে।

সংকলনে: মোহাম্মদ সিদ্দীক হায়দার

বাংলা জাতীয় মাসিক

পরওয়ানা

- ধর্ম-দর্শন, মাসআলা-মাসাইল, ফাদ্বাইল ও আমালিয়াত বিষয়ে লিখুন
- ইতিহাস-ঐতিহ্য, সমাজ-সংস্কৃতি, সমসাময়িক, দেশজ ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে তথ্য সমৃদ্ধ লেখা পাঠান
- মুসলিম মনীষী, আউলিয়াদের জীবন ও গৌরবময় অতীতের আলোকোজ্জ্বল কাহিনী তুলে আনুন আপনার লেখায়

প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে পরবর্তী সংখ্যার জন্য নিম্নোক্ত ই-মেইলে লেখা পাঠাতে হবে

E-mail: parwanabd@gmail.com

পরওয়ানা-এর **গ্রাহক** হওয়ার জন্য **আবেদন?**

পরওয়ানার অনুকূলে আপনার নাম ও পূর্ণ ঠিকানা লিখে পাঠান

বার্ষিক চাঁদার হার

বাংলাদেশ	ঃ ৩০০ টাকা
ভারত	ঃ ১৫০০ টাকা
মধ্যপ্রাচ্যের সকল দেশ	ঃ ২০০০ টাকা
যুক্তরাজ্য ও ইউরোপের সকল দেশ	ঃ ৪০ পাউন্ড/ইউরো
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা	ঃ ৫০ মার্কিন ডলার

এজেন্সির নিয়মাবলি

- ফোন/ই-মেইল/হোয়াটসঅ্যাপ ও অফিসে যোগাযোগ করে চাহিদা জানালে এজেন্সি দেওয়া হয়
- ১০ কপির কমে এজেন্সি দেওয়া হয় না
- প্রত্যেক ৫ কপিতে ১টি সৌজন্য কপি দেওয়া হয়
- সরাসরি এজেন্টের কাছে পত্রিকা পৌঁছানো হবে
- আশেপাশের এজেন্টের ক্ষতি হবে না, এমন নিশ্চয়তা থাকতে হবে।
- যেকোনো সময় কর্তৃপক্ষ যে কারো এজেন্টশিপ বাতিল/পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে। সেক্ষেত্রে গ্রাহকদের বিকল্প মাধ্যমে পত্রিকা পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে

যোগাযোগ

সার্কুলেশন ম্যানেজার

মাসিক পরওয়ানা

বি.এন টাওয়ার, ২৮/১ বি, দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

সিলেট অফিস: পরওয়ানা ভবন ৭৪, শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ সোবহানীঘাট, সিলেট-৩১০০

মোবাইল: ০১৭৯৯৬২৯০৯০ (বিকাশ)

বাংলা বানানের নিয়ম

চাকরিপ্রার্থীদের জন্য উপযোগী করে ক্যারিয়ার পাতাটি সাজানো হয়েছে। এ সংখ্যায় থাকছে **মাতৃভাষা বাংলা**। বিসিএস, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক, বেসরকারি শিক্ষক-প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষার বিগত প্রশ্নাবলি বিশ্লেষণ করে আলোচ্য বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে। চাকরির পরীক্ষায় কমপক্ষে দুইটি বানান শুদ্ধি আসবেই। বাংলাদেশে বাংলা একাডেমির বানান রীতি আদর্শ মান হিসেবে বিবেচিত। গতানুগতিক আলোচনার বাইরে গল্পচ্ছলে কয়েকটি নিয়ম আলোচিত হলো:

১। রেফ-এর পর ব্যঞ্জন বর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন- কার্য্যালয়, কার্ত্তিক না লিখে লিখব কার্যালয়, কার্তিক। অনেকে মনে করেন রেফের পরে য-ফলা হয় না। ধারণা ভুল। যেমন- দৈর্ঘ্য। তবে সাবধান সৌহার্দ লিখতে য-ফলা লিখবেন না।

২। শব্দের শেষে বিসর্গ (ঃ) থাকবে না। মূলতঃ, কার্যতঃ না লিখে লিখব মূলত, কার্যত। কিছু শব্দের মধ্যখানেও বিসর্গ হবে না। যেমন- দুস্থ, নিস্তব্ধ, নিস্পৃহ, নিশ্বাস। নিশ্বাস বানানে বিসর্গ নেই। যদি বিশ্বাস করতে না পারেন তবে অভিধান দেখুন।

৩। বাংলা বানানে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো তৎসম শব্দ। যেসব তৎসম শব্দের শেষে ই/ঈ, উ/ঊ উভয়টি শুদ্ধ কেবল সেসব শব্দে ি হবে। যেমন- পদবি, ধরণি

আবার যদি মনে করেন আধুনিক বাংলা বানানে শব্দের শেষে ঈ-কার মোটেই হয় না। সেটাও ঠিক নয়। তৎসম শব্দের শেষে ঈ-কার থাকতে পারে। যেমন- সহযোগী, সহকারী, কর্মচারী ইত্যাদি।

৪। বিদেশি শব্দে ই-কার হবে। যেমন- সরকারি, ফার্মেসি, লাইব্রেরি।

৫। ভাষা, দেশ ও জাতির নামের শেষে ই-কার হবে। যেমন- বাঙালি, পাকিস্তানি, আরবি, ফারসি, জার্মানি, ইতালি

৬। বিদেশি শব্দের বানানে (ষ, ণ, ছ, ড়, ঢ়) এই ৫টি বর্ণ ব্যবহার করা যাবে না। ছুন্নাত নয় হবে সুন্নাত

৭। অদ্ভুত এবং ভুতুড়ে ছাড়া পৃথিবীর সকল ভূত উ-কার হবে। যেমন- ভূতপূর্ব, আভির্ভূত

৮। শব্দের শেষে ত্ব, তা, বাচক, বিদ্যা, সভা, নী, ণী, পরিষদ, তন্ত্র ইত্যাদি যুক্ত হলে ঈ-কার, ই-কার হবে। যেমন- প্রতিদ্বন্দ্বী>প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সহযোগী>সহযোগী, প্রাণী>প্রাণিবাচক, প্রাণিবিদ্যা, মন্ত্রী>মন্ত্রিপরিষদ, স্থায়ী>স্থায়িত্ব, তপস্বী-তপস্বিনী।

৯। স্ত্রীবাচক তৎসম শব্দের শেষে সর্বদা ঈ-কার হবে। যেমন- জননী, স্ত্রী, নারী, সাধ্বী।

১০। শব্দের শেষে আলি এবং আবলি প্রত্যয় থাকলে সর্বদা ই-কার হবে। যেমন- সোনালি, রূপালি, গুণাবলি, রচনাবলি।

১১। দুর্নাম, দুর্নীতি, দুর্ঘটনা, দুর্নিবার এসকল শব্দে উ-কার হবে। তবে দূর ও দূরত্বে উ-কার থাকবে।

১২। হস-চিহ্ন যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন- কলকল, ঝরঝর।

১৩। উর্ধ্ব-কমা যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন- দুজন, কজন

১৪। সমাসবদ্ধ শব্দগুলি যথাসম্ভব একসঙ্গে লিখতে হবে। রবিবার, সংবাদপত্র, ভালোভাবে, জ্ঞানসম্পন্ন।

১৫। বিশেষ প্রয়োজনে হাইফেন যুক্ত হবে। যেমন- না-বলা কথা। তবে না-বাচক না উপসর্গ সংযুক্ত থাকবে। যেমন- নাবালক, নাহক।

১৬। শব্দের শেষে না-বাচক নি যুক্ত থাকলেও না, নেই আলাদা হবে। যেমন- করি না, যাই না, হয়নি, করিনি, এখানে নেই।

১৭। শব্দের শেষে ও-কার যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন- করল, গেল, এত, করছিল। তবে অর্থ বিভ্রাটের সম্ভাবনা থাকলে ও-কার হতে পারে। যেমন- কালো (রং), কাল (সময়), ভাল (কপাল), ভালো (উৎকৃষ্ট)।

১৮। শব্দ সংক্ষেপের ক্ষেত্রে বিসর্গ নয় একবিন্দু হবে। যেমন- ডা.

১৯। বিদেশি শব্দে ঋ-কার না লিখে র-ফলা হবে। যেমন- ব্রিটেন

ণ-ত্ব বিধান ও ষ-ত্ব বিধান

বাংলা বানানে ক্ষেত্রে ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধির প্রয়োগ গুরুত্বপূর্ণ। কেবল তৎসম শব্দে রয়েছে এর ব্যবহার। তদ্ভব, দেশি, বিদেশি শব্দে এসব চলে না। উভয়টির ব্যবহার অনেকটা সমান। তাই একসাথে আলোচনা করা হচ্ছে।

১। ট-বর্গীয় (ট, ঠ, ড, ঢ) ধ্বনির আগে দন্ত্য 'ন' ব্যবহৃত হয়ে যুক্ত ব্যঞ্জন গঠিত হলে, সব সময় মূর্ধন্য 'ণ' হয়। যেমন- কণ্টক, কাণ্ড, ঘণ্টা, দণ্ড, বণ্টন । বিদেশি শব্দে ন হবে। যেমন ঠান্ডা, ঝান্ডা, গুন্ডা।

২। একইভাবে ট-বর্গীয় বর্ণের সাথে যুক্ত স সব সময় ষ হয়। যেমন- কষ্ট, কনিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ, স্পষ্ট, নষ্ট, কাষ্ঠ, ওষ্ঠ, ভূমিষ্ট। বিদেশি শব্দে স হবে। যেমন- ইস্টওয়েস্ট, পোস্টার, রেস্টুরেন্ট, স্টেশন।

৩। ঋ, র, ষ-এর পরে স্বরধ্বনি, হ, য়, ব, ং এবং ক-বর্গীয় ও প-বর্গীয় ধ্বনি থাকলে পরবর্তী দন্ত্য 'ন' মূর্ধন্য 'ণ' হয়। যেমন- কৃপণ, হরিণ, অর্পণ, শ্রবণ, লক্ষণ, আগ্রহায়ণ, সর্বাঙ্গীণ ইত্যাদি। সর্বাঙ্গীণ শব্দে দেখুন, রেফের পর স্বরধ্বনি, ক-বর্গ এবং প-বর্গের বর্ণ থাকায় ব+আ+ঙ+গ+ঈ ৫টি বর্ণের পরেও ণ হয়েছে।

তবে ক্রিয়াপদে র-এর পর ন হবে। যেমন- ধরুন, করুন, করবেন। বিদেশি শব্দে ন হবে। যেমন- গভর্নর, ইস্টার্ন, ধরন।

ত-বর্গীয় বর্ণের সঙ্গে যুক্ত ন কখনো ণ হয় না। যেমন- গ্রন্থ, প্রান্ত।

৪। একইভাবে ঋ, র, এবং রেফ এর পর 'স' না হয়ে 'ষ' হয়। যেমন- পুরুষ, কৃষক। বিদেশি শব্দে 'স' হবে। যেমন- ভার্সিটি।

৫। অ, আ ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনি এবং ক ও র এর পরে প্রত্যয়ের 'স' থাকলে তা 'ষ' হয়। যেমন- ভবিষ্যৎ, চক্ষুষ্মান, চিকীর্ষা, নিষুতি, মুমূর্ষু

৬। র ধ্বনির পরে যদি অ, আ ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনি থাকে তবে তার পরে 'ষ' হয়। যথা- পরিষ্কার, আবিষ্কার, বহিষ্কার। কিন্তু অ, আ স্বরধ্বনি থাকলে 'স' হবে। যেমন- তিরস্কার, নমস্কার, পুরস্কার।

৭। উপসর্গের পর ই-কার বা উ-কার থাকলে মূল শব্দের প্রথমে 'স' থাকলে তা 'ষ' হয়। যেমন- অভি+সেক> অভিষেক, অনু+সঙ্গ> অনুষঙ্গ, অনু+স্থান> অনুষ্ঠান, বি+সম> বিষম, সু+সুপ্ত> সুষুপ্ত।

৮। সমাসবদ্ধ শব্দে সাধারণত ণ-ত্ব বিধান খাটে না। এরূপ ক্ষেত্রে 'ন' হয়। যেমন- অগ্রনায়ক, কনিষ্ঠ, ত্রিনয়ন, ত্রিহায়ন, নির্নিমেষ, পরনিন্দা, রূপবান, সর্বনাম ইত্যাদি।

সংকলনে: মোহাম্মদ কামরুজ্জামান

কবিতা

বিশ্বনবী মুহাম্মদ ﷺ : স্তুতির ভাষা

আবদুল মুকীত চৌধুরী

বিশ্বনবীর স্তুতির ভাষা সর্বোচ্চ সুন্দর,
শোভন সেরা চয়নযোগ্য শব্দাবলির স্বর।
এ বিন্যাসে ঘাটতে হবে প্রিয় অভিধান,
খুঁজতে হবে শব্দ বিশেষ– যথার্থ সম্মান।
বিশেষণ ও সর্বনামের অলঙ্করণ এই,
বিচ্যুতির অবকাশ কখনোই নেই।
না হলে পণ্ডশ্রম বক্তৃতা-ভাষণ,
মূল্যায়ন নয়, হবে অবমূল্যায়ন।

শব্দ যখন আত্মঘাতী, অভিব্যক্তি ভিন্নতার,
বিশ্বনবীর প্রশংসাতে মূল্যায়নে এন্তার
অবাঞ্ছিত শব্দে ঘটে উল্টো অবমূল্যায়ন,
শব্দচয়ন ব্যর্থ করে আটপৌরে বিশেষণ!

ভুল-শুদ্ধ ফারাকের সুশীল চিন্তনকার?
লক্ষ্যঘাতী শব্দ-'দূষণ' এ ক্ষেত্রে বাধাতার।
পণ্ড হয়ে গেলো যে এ বলা-লেখার আয়োজন,
সর্বোচ্চ সম্মাননায় বিচ্যুতির এ বাচন।
দেদার শব্দ গড়পড়তা হুড়মুড়িয়ে ঢুকে যায়,
মহানবীর প্রশংসাতে বলুন এদের স্থান কোথায়?

বিশ্বনবীর জন্য শব্দচয়ন যে কী বিস্ময়!
যে মস্তিষ্ক-প্রসূততা, স্বচ্ছন্দে হাজির হয়,
স্ব-শ্রুতলিপির ভুলে 'হিমালয়ান' এ 'ব্লান্ডার',
সংশোধন ও উত্তরণ অবশ্যই কাম্য তার।

আম-বিশেষণ বর্জনে 'হ্যাঁ' বলে দিন তো।
স্তুতির ভাষায় শিথিল শব্দ 'না' বলে দিন তো।
'বিরল' বা 'অসাধারণ' সঠিক শব্দ নয়,
বিশ্ব-শ্রেষ্ঠত্বের স্তুতি অনন্য নিশ্চয়।
কাব্য প্রকরণ, শৈলী হোক তা চমৎকার–
আল্লাহ্‌র সালাম-ধন্য নবী মুস্তাফার।
প্রাচীন ভারতে তিনি 'জগতগুরু', তাঁর
শ্রেষ্ঠত্বে হাজিরা হোক সর্বোচ্চ শ্রদ্ধার।

প্রার্থনা

কালাম আজাদ

শুনেছিলাম তোমার স্মরণ থেকে
উৎপন্ন বিশ্বব্যাপ্ত আশা-ভালোবাসা।
শুনেছিলাম নৈরাশ্যে তোমার ঘৃণা
ভরসায় তুমি থাকো চিরন্তন
নৈরাশ্য নাশা।

কই? আশাবাদী আমার অন্ধকারে
আলো তো দেখালে না আসি
একদিনও বাতাসের শব্দ হয়ে
বলেছো কী তোকে ভালোবাসি?
ছুঁয়ে দেখলে না উদ্বাহু আমার
ভিখারী হাতখানা
আমি তো শোণিতাক্ত বুক চিরে
দেখিয়েছি তোমার বিছানা।

এখন তো মাঝে মাঝে ভাবি
পালাবো কোথাও
কিন্তু কোথায়?
সৃষ্টি তো তোমারই নখে আঁকা
বাঘবন্দি মাঠ
এরে ছেড়ে যাওয়া যায় নাতো–!

তাই বলি, একদিন রাত করে এসো
বোধের ভেতরে ভালোবাসি শব্দের ঢেউ তুলে
নিরবেই চলে যেয়ো, বলব না থাকো।।

আকুতি

সৈয়দা নাদিরা হোসেন

মাফ করে দাওগো আল্লাহ
মাফ করো আমায়
এই দুনিয়ার মোহে পড়ে
ভুলে যাই তোমায়।

তুমিতো জগতসমূহের রব
সবার রিযিকদাতা,
একমাত্র তোমার সকাশে
লুটাই মোদের মাথা।

শেষ বিচারের অধিপতি
শোকর, সবর দাও,
সুখে দুঃখে আমায় যেন
চিরকৃতজ্ঞ পাও।

ভুলে যাই গাফুরুর রাহীম
ভুলে যাই তোমায়,
শয়তানের ফাঁদ হতে
বাঁচাও গো আমায়।

জীবন-মরণ সবকিছুরই
মালিক তুমি হও,
তুমি যদি না করো ক্ষমা
কে করিবে কও?

তোমার কাছে সদা আমার
এই আকুতি হয়,
পাপ থেকে দূরে থাকি যেন
মনে রেখে ভয়।

স্বাগতম হে পরওয়ানা

পিয়ার মাহমুদ

পরওয়ানা তুমি এসেছ ফিরে
স্বাগতম তোমার আগমন
প্রতি নিশ্বাসে বিশ্বাস রাখি
ঘটাবে আবার জাগরণ।

তোমার প্রতি ভালোবাসা ছিল
সারাটা হৃদয়জুড়ে
তোমার বিরহে মনটা আমার
কালো ছাই পুঁড়ে পুঁড়ে।

এসেছ যখন দোহাই তোমার
যেও নাকো আর ছেড়ে
কোনো অমানিশা পারে না যে নিতে
আমাদের হতে কেড়ে।

শত চেষ্টায় পৌঁছাব তোমায়
মুমিনের ঘরে ঘরে
মুসলমানের মুখপত্র রবে
জনম জনম ধরে।

নবীদের গল্প

সোনার চাঁদ

এয়াকুব আলী চৌধুরী

আসিলেন, নূরের হাসি চোখে, চাঁদের হাসি মুখে, নবী আসিলেন; ফুলের গন্ধ গায় মাখিয়া দিন দুনিয়ার বাদশা আসিলেন। আসিলেন তো, কিন্তু কেমন করিয়া? ফকির হইয়া; দুনিয়ার যত অনাথ, এতিম তাদের সঙ্গে এক হইয়া, তাদের ব্যথার ব্যথী হইয়া।

কেন?–কোল জুড়িয়া বুক ভরিয়া এমন চাঁদপারা ধন,–এমন সোনার রতন,–তবু আমেনা মায়ের চোখের কোণে পানি কেন, কেমন করিয়া বলিব, কেন?–নূরনবী যে বাপহারা হইয়া আসিয়াছেন। মায়ের কোলে ত সোনার চাঁদ, কিন্তু বাবা গিয়াছিলেন বাণিজ্যে; বাণিজ্যেই তিনি মারা যান। সে নবীর জন্মের ছয় মাস আগে।

তারপর কি হইল? নূরনবীর দাদা আবদুল মোত্তালেব, তিনি করিলেন কি, হালিমা নামে একজন ধাই, তাঁর কাছে নবীকে সঁপিয়া দিলেন। হালিমা তাঁকে পালন করিবেন,–দেশের তাই ছিল তখন নিয়ম। ছেলে হইলে ধাইমাতে পালন করিত। হইলও তাই; হালিমা নবীকে বুকে চাপিয়া বাড়ী লইয়া গেলেন। মক্কা শরীফ হইতে সে অনেক দূরে। হজরত ত এদিকে মায়ের কোল ছাড়া হইলেন, ওদিকে আবার হালিমার কি হইল, তাই শুন। সে কিন্তু বড় খুশীর কথা।

হালিমার একটি রোগা মরা গাধা ছিল। শুকাইয়া হাড় হইয়া গিয়াছিল, চাহিতে চাহিতে পড়িয়া যাইত, আজ মরে কি কাল মরে এইরূপ অবস্থা। সেই গাধার পিঠে যখন হজরতকে লইয়া হালিমা সওয়ার হইলেন, তখন সেই রোগা মরা গাধা লাফাইয়া চলিল। তার গায়ে যেন হাতির বল হইল। রাজপুত্রের পক্ষীরাজ ঘোড়ার মত সে যেন উড়িয়া চলিল। মোটা তাজা সকল গাধার আগে সে বাড়ী পৌঁছিল।

আরও অনেক কিছু অবাক কাণ্ড ঘটিল। হালিমার দেশে আকাল পড়িয়া সকলের বড় কষ্ট হইয়াছিল। গাছপালা শুকাইয়া গিয়াছিল। মাঠে ঘাস ছিল না, কুয়ার পানি ছিল না, ছাগল ভেড়া খাইতে পাইত না। এমন সময় হজরত সেখানে যান। আর অমনি হালিমার ঘরে সুখ উথলিয়া উঠিল, চারিদিকে সুলক্ষণ দেখা দিল। ক্ষেত খামারে ফসল হইল। যব গমে হালিমার ঘর ভরিয়া গেল। কুয়া নালিতে পানি হইল। গাছে গাছে গোছায় গোছায় রাঙ্গা রাঙ্গা খেজুর খোরমা পাকিয়া উঠিল। ছাগল, ভেড়া, উট, গাধা খাইয়া তাজা হইল। লোকের কষ্ট গেল। যেন রাজপুত্র আসায় গল্পের সেই ঘুমন্ত পুরীর সকলে চোখের পলকে চোখ মেলিয়া জাগিয়া উঠিল, যেন সিংহাসনে রাজা, হাতিশালে হাতি, আর ঘোড়াশালে ঘোড়া জাগিল; যেন হাট বাজারে হাই তুলিয়া দোকানী পসারী জাগিয়া উঠিল।

কেন এমন হইল জান? তিনি যে আল্লার দয়ার মত পৃথিবীতে আসিয়াছেন। তাই তিনি যেখানে যাইতেন সেখানেই মঙ্গল হইত, সেখানেই হাসি ফুটিত।

হজরত বাড়ীতে থাকেন, আর হালিমার ছেলেরা মাঠে মাঠে ছাগল চরায়। হজরতের কাছে এটা মোটেই ভাল লাগিল না। তিনি মজার সুখে বাড়ী বসিয়া থাকিবেন, আর তার দুধ-ভাইরা মাঠে মাঠে কষ্ট করিয়া বেড়াইবে, তাও কি হয়। হজরত ধাইমাকে বললেন, 'আমার দুধ ভাইরা কোথায় যায়, কি করে? আমিও তাদের সাথে যা'বো। তারা যা করে তাই করব।" হালিমা অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু হজরত মানিলেন না। তারপর হইতে দুধ ভাইদের সাথে মাঠে যাইয়া ছাগল চরাইতেন। এমন করে চার বছর গেল।

তারপর হালিমা বিবি হজরতকে লইয়া আমেনা মায়ের কোলে দিয়া আসিলেন। আমেনা বিবি বুকের ধন বুকে তুলিয়া লইলেন। খুশী হইয়া হালিমাকে সাধ্যমত টাকা-কড়ি, কাপড়-চোপড় বখ্‌শিস দিলেন। ছেলে দেখিয়া তার মনে আনন্দ ধরে না। সুন্দর শিশু মধুর দেহ, হাত পা যেন ননী দিয়া গড়া; চোখ দুটি ভাসা ভাসা, মায়া মমতায় ভরা, মুখে হাসি পোরা, রূপের ঝলক, পুণ্যের চমক। আমেনা বিবি হজরতকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন, চোখে মুখে হাজার হাজার চুমো দিলেন। কত আদর, কত সোহাগ করিলেন।

কিন্তু হজরত বেশি দিন এ সোহাগ ভোগ করিতে পারিলেন না। ছয় বছরের সময় আমেনা জননী হজরতকে ছাড়িয়া গেলেন। ছয় বছরেই আমাদের নবী বাপ-মা হারা অনাথ হইলেন। তোমরা বাপের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কত সুখ পাও, মায়ের বুকে মাথা রাখিয়া কত মজা পাও; বাপ তোমাদিগকে কত রকম মিঠাই সন্দেশ কিনিয়া দেন, তোমরা কত সুখে খাইয়া বেড়াও; তোমাদের মা তোমাদের কত সোহাগ করেন, কত যত্ন করেন, কত কষ্ট দূর করেন।

কিন্তু অতি ছোট কালেই হজরতের এ সব সুখ মিটিয়া গিয়াছিল। সুখ করিতে তিনি দুনিয়ায় আসেন নাই। যাতে লোকের ব্যথার

ব্যথী হইতে পারেন এই জন্যই তাঁর আসা। তিনি "রহমতুল্‌লিল আ'লামিন"–মানুষের কাছে মঙ্গল আর দয়া।

নিজে দুঃখে না পড়িলে ত পরের দুঃখ বুঝা যায় না! আগুনে পোড়ার কি যন্ত্রণা, যার গায়ে কখনও আগুন লাগে নাই, সে কি তা জানিতে পারে? যে রোজ দুই বেলা কোরমা পোলাও খায়, চাহিবার আগেই খাবার পায়, সে কি কখনও ক্ষুধার কষ্ট বুঝিতে পারে? সে কি বুঝিতে পারে ঐ যে দুয়ারে দুয়ারে দুঃখী কাঙ্গাল ভাতের জন্য কাঁদিয়া বেড়ায়, তাদের কি কষ্ট! তা' বুঝিতে হইলে নিজে আগে ক্ষুধা সহিতে হয়; তবেই তাদের ব্যথার ব্যথী হওয়া যায়।

পরের ব্যথা বুঝবে যে
ব্যথা আগে সইবে সে।

এইজন্যই আল্লাতা'লা নূরনবীকে ছেলেবেলা হইতেই অনাথ করেন, কাঙ্গাল করিয়া দুঃখে ফেলেন। মানুষের যত রকম দুঃখ-কষ্ট হইতে পারে, সব রকম কষ্টই তিনি সহিয়াছিলেন। সেসব ক্রমে ক্রমে জানিতে পারিবে।

মা বাপ তো গেলেন। এখন থাকিলেন কেবল বুড়ো দাদা আবদুল মোত্তালেব। তিনি কি করিলেন, চোখের পানি ফেলিতে ফেলিতে হজরতকে বুকে তুলিয়া লইলেন। বুকে পিঠে করিয়া মানুষ করিতে লাগিলেন।

তোমরা মনে করিতেছ নূরনবী বুঝি এইবার দাদার কাঁধে চড়িয়া খুব কিছুদিন মজা করিবেন–তা' নয়। দাদারও ডাক পড়িল। দুই বছর ঘুরিতে না ঘুরিতে আবদুল মোত্তালেব নবীকে ছাড়িয়া গেলেন। মায়ের বুক, বাপের কোল, দাদার পিঠ সবই শেষ হইয়া গেল।–আট বছর বয়সেই সব ফুরাইল।

তারপর?–তারপর আর কি হইবে,–আবদুল্লার আপন ভাই আবু তালেব, তিনি হজরতের ভার নিলেন; পরম যত্নে হজরতকে পালন করিতে লাগিলেন। নূরনবীর চাচাদের মধ্যে তিনি বড়ই ভাল লোক ছিলেন। তিনি নূরনবীকে প্রাণের সঙ্গে ভালবাসিতেন। হজরত যাতে মা বাপের কষ্ট না বুঝিতে পারেন, সর্বদা সেই দিকে নজর রাখিতেন। তিনি নিজে বড়ই গরীব ছিলেন, তবুও নিজে কষ্ট করিয়া হজরতকে পালন করিতেন।

গরীবের ঘরে গরীবের যত্নে হজরত বাড়িয়া উঠিতে লাগিলেন। তোমরা যেমন দিনরাত খেলাধূলা, আমোদ-আহ্লাদ করিয়া বেড়াও, নূরনবী তেমন হাসিখেলা লইয়া থাকিতেন না। খেলিবার জন্য তিনি আসেন নাই। আশেপাশে মানুষের কষ্ট দেখিয়া তাঁর মন কাঁদিয়া উঠিত। চারিদিকে এত অন্যায়, অত্যাচার, মারামারি, কাটাকাটি দেখিয়া তাঁর প্রাণ বেদনায় ভরিয়া উঠিত। তিনি আপন মনে নিরালায় গম্ভীর হইয়া বসিয়া থাকিতেন। বসিয়া বসিয়া আপন মনে ভাবিতেন। কি যে ভাবিতেন, তা তিনিই জানিতেন। আর কেউ তার খবর রাখিত না। কখনো কখনো তিনি বাড়ী হইতে বাহির হইতেন; অনেক দূরে মাঠ, সেই মাঠের মধ্যে চলিয়া যাইতেন; আর খোলা ময়দানে দাঁড়াইয়া আল্লার সৃষ্টি দেখিতেন। মাথার উপর ঐ সীমাহীন আকাশ, নীল আর নীল, যত দূর চোখ যায় তত দূর নীল, কত বড়–কত বড় এ; কোথা হইতে আসিয়াছে, কোথায় মিশিয়াছে! চারদিকে স্বভাবের সবুজ শোভা, আকাশ ছাপিয়া ভুবন ভরিয়া আলোর মালা। এই অপার শোভার মধ্যে তাঁর মন একেবারে ডুবিয়া যাইত! তিনি অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিতেন। কি যেন দেখিতেন, কার যেন ডাক শুনা যাইত; কি যেন দুঃখের সুরে প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত। তিনি আকুল হইয়া পড়িতেন।

মাঠের ছেলেপেলেরা তাঁর মিষ্টিমধুর কথা শুনিয়া মজিয়া যাইত, তাঁর সঙ্গে খেলিতে চাহিত। কিন্তু তিনি ত আর খেলার জন্য আসেন নাই যে দলে মিশিয়া খেলা করিবেন। তিনি বলিতেন– "ওগো না, মিছে আমোদ-আহ্লাদ করার জন্য মানুষের সৃষ্টি হয়নি, বড় কাজের জন্য তার জন্ম।"

কটু কথা কাহাকে বলে, কেমন করিয়া গালি দিতে হয়, তাহা তিনি মোটেই জানিতেন না। সকলের সঙ্গেই হাসিয়া কথা বলিতেন। সে হাসিতে জোছনা ফুটিত, মধু ঝরিত। সেই মিষ্ট কথা যে শুনিত, সে মুগ্ধ হইত, সেই তাঁকে ভালবাসিত।

তোমরা কি সকলের সঙ্গে তেমন মিষ্ট কথা বলিবে?–কেবল খেলার কথা না ভাবিয়া কাজের কথা ভাবিবে? তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে ভালবাসিতেন।●

গল্প

রাহীনের পাখিপ্রেম

রেদ্বওয়ান মাহমুদ

রাহীন মনে মনে আজ ভীষণ খুশি। বাবার সাথে মেলায় যাবে সে। সপ্তাহে প্রতি রবিবার নদীর পারে মেলা বসে। খেলনা, খাবার, মোরগ, পাখি কিছুই বাদ নেই, সবই পাওয়া যায় এখানে। রাহীনের অনেক আগের বায়না সে কবুতর কিনবে। এবার পরীক্ষার আগে বাবা বলেছিলেন ক্লাসে প্রথম হলেই তবে কবুতর কিনে দিবেন। যেমন কথা তেমন কাজ। পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে রাহীন। এবার কবুতর কেনার পালা। আঁকাবাঁকা মেঠো পথ ধরে বাবার সাথে মেলায় গেল সে। হৈ-হুল্লোড় আর ভিড়ের মাঝখান থেকে পছন্দমতো একটা কবুতর কেনা হলো। কী যে ভারী খুশি! বাবা কবুতরকে রাখার জন্য দারুণ একটা ঘর বানিয়ে দিলেন। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত এখন রাহীনের খেলার সাথী সফেদ কবুতরটি। স্কুলে যাওয়ার আগে খাবার দেওয়া আবার স্কুল থেকে ফিরেই কবুতরের সাথে খেলায় মেতে ওঠা, গোসল করানো সবকিছুই ঠিক মতো করে সে। রাহীনের মাঝে মাঝে অনেক রাগ হয়। সে তার কবুতরকে যখন খাবার দেয়, তখন আরো কিছু পাখি কোত্থেকে উড়ে আসে, আর খাবারে ভাগ বসায়। রাহীন তাদের ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। একদিন মা বললেন, সৃষ্টিকর্তার সকল সৃষ্টিকেই ভালোবাসতে হয়। ওরা

একটু খাবার পেলে খুব খুশি হবে। সেই থেকে রাহীন তার কবুতরের সাথে আশপাশের পাখিদেরও খাবার দেয়। পাখিদের সাথে আনন্দে আনন্দে কেটে যায় তার পুরোটা দিন। ●

দাদা ভাইয়ের সাথে বৃক্ষরোপণ

সায়্যিদা আমাতুল্লাহ

হাসান ও হুসাইন দুই ভাই। তারা মিলেমিশে খেলাধুলা ঘুরাঘুরি আর গল্প করে। প্রতিদিন দাদা ভাইয়ের সাথে মসজিদে গিয়ে নামায পড়ে। নামাযে যাওয়া-আসার পথে দাদা ভাইয়ের সাথে অনেক গল্প হয় তাদের। দাদা ভাইয়ের কুরআন, হাদিস থেকে বলা গল্পগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে শুনে। দাদা ভাইয়ের কথা শুনতে তাদের ভীষণ ভালোও লাগে।

দাদাভাই আজ আসরের নামায থেকে বের হয়ে বললেন, এই পৃথিবীতে বসবাসের জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদের যত নিআমত দান করেছেন তার মাঝে অন্যতম হলো গাছ। গাছ থেকে আমরা বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেন পাই। বিভিন্ন প্রকার গাছপালা দিয়ে আল্লাহপাক পৃথিবীকে সুশোভিত করেছেন। এতে রয়েছে আমাদের জন্য নিদর্শন। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, "যখন কোনো মুসলমান গাছ লাগায় অথবা ফসল বুনে আর মানুষ, পশুপাখি তা থেকে খায়, এটা রোপণকারীর জন্য সাদকাহ হিসেবে গণ্য হয়।" হাসান কথাটা শুনে খুব অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, গাছ লাগালেই সাদকাহ হবে? দাদাভাই বললেন, হ্যাঁ, যতদিন গাছটি বেঁচে থাকবে ততদিন সাদকায়ে জারিয়া হিসেবে গণ্য হবে।

হুসাইন বলল, আচ্ছা আমাদের বাড়ির পিছনে তো অনেক জায়গা ফাঁকা আছে, আমরা কি সেই খালি জায়গায় গাছ লাগাতে পারি না? হুসাইনের কথার সাথে হাসান একটু যোগ করে বলল, আমরা চাইলে তো তা করতেই পারি তাই না দাদাভাই? তাদের কথা শুনে দাদাভাই তো মহাখুশি। দাদাভাই তাদেরকে নিয়ে নার্সারিতে গেলেন। হাসান আর হুসাইন নার্সারি থেকে নিম গাছ, পেয়ারা গাছ, ডালিম গাছসহ আরো অনেক গাছের চারা কিনল, সাথে কিনল নানা রকমের ফুল গাছ। এবার গাছ রোপণের পালা। তারা বাড়ির পিছনের খালি জায়গায় গেল। দাদা ভাই একটা নিমগাছ রোপণ করে হাসান ও হুসাইনকে দেখিয়ে দিলেন কিভাবে গাছ রোপণ করতে হয়। তারা দাদা ভাইয়ের সাথে মিলে সবগুলো গাছ রোপণ করা শেষ করল। দাদাভাই তাদেরকে জড়িয়ে ধরলেন এবং তাদের জন্য অনেক দুআ করলেন। ●

অহংকারী বটগাছ

জান্নাতুল ফেরদৌস মরিয়ম

অনেক দিন আগের কথা। এক বনে ছিল একটি বটগাছ। বট গাছটি ছিল বনের সব গাছ থেকে বড় ও লম্বা। সে নিজেকে নিয়ে অনেক অহংকার করত। সে তার ডালে কোনো পাখি বসতে দিত না। পাশেই ছিল একটি আমগাছ। আম গাছটি ছিল অনেক ভালো। তার ডালে বসে পাখিরা সারাদিন গান গাইত। একদিন একদল মৌমাছি কোথায় বাসা বানাবে খুঁজছিল। খুঁজতে খুঁজতে বট গাছকে দেখতে পায়। বটগাছ দেখে তাদের খুবই আনন্দ হয়। মৌমাছিদের রাণী বলে আমরা এখানে বাসা বানাব, বটগাছটি অনেক বড় ও লম্বা। মৌমাছির কথা শুনে বটগাছটি রেগে গিয়ে বলল, আমার ডালের ধারে কাছেও এসো না। তোমাদেরকে একদম ভালো লাগে না আমার। আম গাছটি মৌমাছিদের বলল, তোমরা আমার ডালে বাসা বানাও। মৌমাছিরা আম গাছের ডালে তাদের বাসা বানায়। কয়েকদিন পরে দুজন কাঠুরে বনে আসে কাঠ সংগ্রহ করার জন্য। কাঠুরেরা বটগাছটি দেখে বলল, এই গাছটি খুব বড় ও লম্বা। এটা থেকে আমরা অনেক কাঠ সংগ্রহ করতে পারব। চলো এই গাছটিকে আমরা কাটা শুরু করি। এই বলে কাঠুরে দুজন গাছটি কাটতে শুরু করে। তখন বটগাছটি আমগাছকে কেঁদে কেঁদে বলে বন্ধু আমগাছ! আমাকে বাঁচাও।

তখন আমগাছ মৌমাছির রাণীকে ডেকে বটগাছের বিপদের কথা বলল। মৌমাছির রাণী বলল, আমরা তাকে কেন বাঁচাবো? সে আমাদেরকে তার ডালে বাসা বুনতে দেয়নি। আমগাছটি বলল, বটগাছ অহংকার করেছে বলে তার আজ এই অবস্থা। তাই বলে তোমরাও তার মতো অহংকার করো না। এখন তাকে আমাদের বাঁচানো কর্তব্য। যাও, তোমরা গিয়ে তাকে সাহায্য করো। আমগাছের কথা শুনে মৌমাছিরা বটগাছকে বাঁচাতে যায়। যে কাঠুরেরা বটগাছকে কাটতে এসেছিল মৌমাছিরা তাদের কামড়ে দেয় এবং তাড়া করতে থাকে। মৌমাছির তাড়া খেয়ে কাঠুরেরা দৌড়ে পালাতে থাকে। বটগাছ মৌমাছি ও আমগাছের কাছে অহংকারের জন্য লজ্জিত হয়ে ক্ষমা চায়। তখন আমগাছ ও মৌমাছিরা তাকে ক্ষমা করে দেয়। এ থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত, অহংকার পতনের মূল। অহংকার থেকে বেঁচে থাকতে হবে। একে অপরের সাহায্যে এগিয়ে আসতে হবে। অন্যের বিপদে নিজেকে বিলিয়ে দিতে হবে। ●

প্রিয় সোনামণিরা শোনো
মহিউদ্দিন হায়দার

শোনো! প্রিয় সোনামণিরা শোনো
তোমাদেরে কে সব থেকে ভালোবাসতেন জানো ?
তিনি আর কেউ নন জ্যোতির্ময় মনুষ্য অতুল
বিশ্বনিখিলের মুক্তিদূত পিয়ারা মুহাম্মদ রাসূল।

তাঁরই আগমনে আসে আঁধার ধরায় নবজাগরণ
দ্যুলোক-ভূলোকজুড়ে জাগে খুশির শিহরণ
কুলজাহানে লাগে বিমোহিত কলতান
ঈর্ষায় জ্বলেপুড়ে মরে মুনাফিক-শয়তান।

শিশুগণে তিনি ছিলেন সকলের সেরা
তাদের সাথে সখ্যতা ছিল তাঁর মমতায় ঘেরা
সুকুমার চিন্তায় মন ছিল নিত্য বিভোর
বিপন্ন মানবতা উদ্ধারে সন্ধ্যা হয়েছে ভোর।

সকলের কাছে সুখ্যাতি ছিল তাঁর 'আল আমীন' বলে
তাঁর হাত ধরেই পাণ্ডুর পৃথিবীতে আলোর মশাল জ্বলে
শত্রু-মিত্র সকলের সাথে ছিল তাঁর মধুর ব্যবহার
সদাচারই ছিল তাঁর বিশ্বজয়ের নন্দন সমাচার।

মানুষকে অবহেলা করা ছিল তাঁর স্বভাব-বৈরী
রহমতে আলমের জীবনটাই আলোর ফ্রেমে তৈরি
এসো হাতে হাত রেখে করি শপথ সবাই
অনন্ত প্রেমের সিন্ধুতে হুব্বে রাসূলের কিশতি ভাসাই।

পরওয়ানা
এস এম মনোয়ার হোসেন

পরওয়ানা আবার আসছে শুনে লাগলো অনেক ভালো
থাকবে সেথায় শিখার বিষয় দিবে জ্ঞানের আলো।

পরওয়ানা যেন রঙিন ডানার প্রজাপতির হাসি
তাকে সবাই হৃদয় দিয়ে অশেষ ভালোবাসি।

খুঁজি তাতে স্বপ্নময় এক সঠিক জীবন পথ
থাকবে তাতে সত্য-সহীহ আকাবীরের মত।

পরওয়ানা হলো সুন্নিয়তের দীপ্ত মশাল বাতি
তাইতো সবাই করছি তাকে পথ চলার সাথী।

নতুন যাত্রা সুদৃঢ় হোক এইতো মনের চাওয়া
সার্থক হোক নতুনভাবে তোমায় কাছে পাওয়া।

সময়
আলিম উদ্দিন আলম

কখনও আঁধার কখনও আলো কখনও ঘূর্ণিঝড়
কখনও সবাই আপন হয়ে যায়, আপন কখনও পর।
মিষ্টি কথায় কখনও আদরে কখনও অবহেলা
সময়ের কাছে সব কিছুই ভালো মন্দের খেলা।

সহজ কখনও কঠিন হয়ে যায় হাতের নাগালও দূরে
কখনও গান ভালো লাগে না মিষ্টি মধুর সুরে।
দিনকে কখনও রাত মনে হয় অন্ধকারে ঢাকা
সময় কখনও আটক করে জীবন গাড়ির চাকা।

মনের খুশে কখনও সুখে আয়েশে যায় দিন
লাভ শুধু লাভ নেইকো অভাব জীবনটা রঙিন।
কখনও আবার সবই সাবাড় হারায় লাভের গতি
যেখানেই আশা সেখানেই হতাশা ক্ষতি শুধুই ক্ষতি।

জীবন থাকতে বুঝি না মোরা বেঁচে থাকার মর্ম
চিরদিন মানুষ বেঁচে থাকে না বেঁচে থাকে তার কর্ম।
আসুক দুর্দিন যতই কঠিন সত্যের হবে জয়
জীবনের গতি সমান থাকে না সব সময়।

ফুলতলী ছাহেব
খাতুনে জান্নাত রাহিমা বীথি

তোমার বিয়োগ ব্যথায় আজও কান্না ভুবনে
দিন কেটে যায় শূন্যতার এক অতল গহীনে।

খুব গোপনে দহন জ্বালা পোড়ায় মনটাকে
চিরচেনা সেই তুমি কি ভুলবে আমাকে।

সীমাহীন পাপ নিয়ে দাঁড়াবো যখন হাশরে
পাশে থেকো সাথী হয়ে কঠিন সেই আসরে।

জগত জুড়ে সম্মানিত তুমি সুগন্ধি এক কলি
বিয়োগ ব্যথায় কাঁদি আমি হে আল্লাহর ওলী।

বলতো দেখি?

১. কুরআন শরীফের প্রথম হরফ কোনটি?
২. হযরত আলী (রা.) কুরাইশ বংশের কোন গোত্রের লোক ছিলেন?
৩. নকশবন্দিয়্যা সিলসিলার প্রবর্তক কে?
৪. কোন সুলতান প্রথম আয়া সোফিয়াকে মসজিদে রূপান্তরিত করেন?
৫. এহইয়াউ উলূমিদ্দীন গ্রন্থের লেখক কে?

বন্ধুরা, উত্তর পেতে সংখ্যাটি ভালো করে পড়ো।

['বলতো দেখি'র সঠিক জবাবদাতাদের মধ্য থেকে নম্বরের ভিত্তিতে ক্রমানুসারে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান নির্ধারণ করে তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে]

আন্দালিব ভাই সমীপে...

প্রিয় আন্দালিব ভাই, পরওয়ানা নিয়মিত প্রকাশ হচ্ছে জেনে খুব খুশি হলাম। আনন্দিত হয়েছি প্রিয় আবাবীল ফৌজ আরও সমৃদ্ধ হচ্ছে জেনে। আবাবীল ফৌজে আমরা নিত্য নতুন বিষয় জানতে পারবো আশা করছি। আবাবীল ফৌজের সকল সদস্যের জন্য শুভকামনা।

মাহফুজুর রহমান রিফাত
আনন্দনগর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, রামপুরা, ঢাকা

-আন্দালিব ভাই: তোমার চিঠির জন্য অনেক ধন্যবাদ। তোমাদের অংশগ্রহণে আবাবীল ফৌজ হবে আরও সমৃদ্ধ। তোমার ভালো লেখাটি এখনই পাঠিয়ে দাও আবাবীল ফৌজের ঠিকানায়।

প্রিয় আন্দালিব ভাই, আশা করি আপনি ভালো আছেন, আমরাও ভালো আছি। এমন এক সময় পরওয়ানার আগমন, যখন আমরা শুধু বাসায় বসে বসে সময় কাটাতে হয়। কিছুই ভালো লাগেনা। পরওয়ানা তুমি খুব তাড়াতাড়ি এসো, আমি অপেক্ষা করছি কিন্তু।

তাওহীদুর রহমান মাহি
দক্ষিণ সুরমা, সিলেট

-আন্দালিব ভাই: হুম..... আমরা ভালো আছি। আবাবীল ফৌজকে সঙ্গী হিসেবে নিয়েছো শুনে খুশি হলাম। পরওয়ানা পড়ো, আবাবীল ফৌজে লিখো। আর হ্যাঁ, মনে রাখবে, পাঠ্যবই পড়া কিন্তু নিয়মিত চালিয়ে যেতে হবে। পরওয়ানা সময়মতো পৌঁছে যাবে তোমার হাতে ইনশাআল্লাহ। মাঝেমধ্যে একটু আধটু জ্যাম থাকলে কিন্তু মন খারাপ করা যাবেনা, বুঝলে?

প্রিয় আন্দালিব ভাই, জানুয়ারিতে তুমি আসবে বলে অপেক্ষার প্রহর গুনছি। তুমি কবে আসবে বলোতো? এতো দেরি করলে কি হয় বলো? খুব তাড়াতাড়ি এসো। শীতের সকালে বারান্দায় বসে প্রিয় পরওয়ানা পড়তে চাই।

মারইয়াম রেদওয়ান
জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট

-আন্দালিব ভাই: এইতো আমি চলে এলাম। এবার খুশিতো? হুম; শীতের সকালে হালকা রোদে বসে রোদ পোহাবার মজাই আলাদা। আর তখন যদি পাশে থাকে প্রিয় পরওয়ানা তাহলেতো কথাই নেই। তবে হ্যাঁ, শীতের পিঠাপুলির দাওয়াত যেনো পাই, কেমন?

প্রিয় আন্দালিব ভাই, ২০২১ সাল কিন্তু আমাদের দোড় গোড়ায়। জানুয়ারিতে আমরা নতুন ক্লাসে পাড়ি দিচ্ছি। দুআ করবে; নতুন ক্লাসের নতুন বই যেনো সহজে পড়তে পারি, আর প্রতিমাসে পরওয়ানা যেনো হাতে পাই, সেই প্রত্যাশা রাখছি।

আব্দুল্লাহ আল মুসাদ্দিক কাউসার
কাদিপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার

-আন্দালিব ভাই: হুম, তোমাকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা। নতুন ক্লাসের নতুন বই পেয়ে খুব খুশি তাই না? হ্যাঁ, তোমার খুশি আরও বাড়িয়ে দিতে কিন্তু তোমার প্রিয় পত্রিকা পরওয়ানা নতুন সাজে হাজির। নতুন ক্লাসে পরওয়ানার পক্ষ থেকে তোমাকে স্বাগতম।

প্রিয় আন্দালিব ভাই, পরওয়ানার আবাবীল ফৌজের অনেক নতুন নতুন বিষয় যোগ হচ্ছে শুনে আনন্দিত হলাম। আশা করি, পরওয়ানা এভাবে সবসময় আমার জ্ঞানরাজ্যের রাজা হয়ে সাথে থাকবে।

নিশাত বিনতে সাঈদ
গোয়াবাড়ি, জকিগঞ্জ, সিলেট

-আন্দালিব ভাই: --তুমি ঠিক বলেছো। পরওয়ানা তোমাদের প্রিয় আবাবীল ফৌজকে আরও সাজাতে বদ্ধপরিকর। তার

জন্য প্রয়োজন তোমাদের নিয়মিত অংশগ্রহণ। তোমার ভালো লেখাটি এখনই পাঠিয়ে দাও আবাবীল ফৌজের অনুকূলে।

প্রিয় আন্দালিব ভাই, আমি আবাবীল ফৌজের সদস্য হতে চাই। আবাবীল ফৌজের সদস্য হওয়ার জন্য কি কি লাগবে এবং সদস্য হলে বিশেষ সুবিধা কী যদি বলতেন?

তাসনিম হাসান শাহী
ফেঞ্চুগঞ্জ মোহাম্মদিয়া হিফযুল কুরআন মাদরাসা, সিলেট

-আন্দালিব ভাই: খুবই প্রয়োজনীয় কথা বলেছো। আবাবীল ফৌজের সদস্য হওয়ার জন্য তুমি নির্ধারিত কুপনটি পূরণ করে ডাকযোগে পাঠিয়ে দিতে পারো। অথবা ছবি তুলে ই-মেইলও করতে পারো। তাহলেই তুমি সদস্য হতে পারবে। তোমার নাম ঠিকানা ছাপা হবে পরবর্তী সংখ্যায়। আর সদস্য হলে তুমি পরওয়ানার বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। পরওয়ানার বিশেষ কোনো প্রোগ্রামে তোমার অংশগ্রহণও উন্মুক্ত থাকবে।

প্রিয় আন্দালিব ভাই, আমি কবিতা লিখতে পারি। কিন্তু আমার কবিতা কি পরওয়ানায় ছাপা হবে? আমি কবিতা কিভাবে পাঠাতে পারি?

সাফওয়ান তেব্রিজ
বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা

-আন্দালিব ভাই: ধন্যবাদ কবি সাফওয়ান। তোমাদের লেখা ছাপানোর জন্যই তো এ বিভাগ। তুমি নিয়মাবলি ও লেখা পাঠানোর ঠিকানা দেখে নিতে পারো।

সদস্য কুপন

প্রিয় আন্দালিব ভাই, আমি 'আবাবীল ফৌজ' এর সদস্য হতে চাই। আমার বয়স ১৬ বছরের বেশি নয়। আমি ফৌজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে নিজেকে সচেষ্ট রাখবো।

নাম: .....

পিতা/অভিভাবক: .....

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: ..... শ্রেণি: .....

গ্রাম: ..... ডাক: .....

থানা: ..... জেলা: .....

কুপনটি পূরণ করে ডাকযোগে নিচের ঠিকানায় অথবা ছবি তুলে ই-মেইলে পাঠিয়ে দাও।

আন্দালিব ভাই
পরিচালক, আবাবীল ফৌজ
মাসিক পরওয়ানা
বি.এন টাওয়ার, ২৮/১ বি, দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
সিলেট অফিস: পরওয়ানা ভবন ৭৪, শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ, সোবহানীঘাট সিলেট-৩১০০
Mobile: 01799 629090, E-mail: parwanaafbd@gmail.com

আন্দালিব ভাইয়ের চিঠি

বন্ধুরা,

কেমন আছো তোমরা? আশা করি এ বৈশ্বিক দুর্যোগ সময়ে ভালো এবং সুস্থই আছো। পরওয়ানা পরিবারের শুভেচ্ছা নিও। মহামারীজনিত কারণে দীর্ঘদিন থেকে তোমাদের প্রতিষ্ঠান বন্ধ। বাসায় বসে বসেই পড়াশোনা করছো তাইনা? স্কুল, মাদরাসায় যাওয়া আসা হচ্ছে না, তাই তোমাদের হাতে পর্যাপ্ত সময় রয়েছে। তোমরাও সময় কাটানোর বিভিন্ন মাধ্যম খুঁজছো? হ্যাঁ, তোমাদের কথা চিন্তা করেই নতুন আঙ্গিকে তোমাদের কাছে হাজির হয়েছে তোমাদেরই প্রিয় পত্রিকা মাসিক পরওয়ানা। তোমরা জেনে আরও আনন্দিত হবে, তোমাদেরই বিভাগ আবাবীল ফৌজে কিন্তু এ সংখ্যায় অনেক নতুন নতুন বিভাগ যুক্ত হয়েছে। যেখানে তোমাদেরই লেখা ছাপা হবে। তোমরাই হবে এ বিভাগের পাঠক ও লেখক।

জানুয়ারি, গ্রেগরীয় বছরের প্রথম মাস। নতুন বছরে নতুন ক্লাসে পদার্পণ করছো তোমরা। নতুন বইয়ের গন্ধে এখন কিন্তু ফুরফুরে মেজাজ। এই আনন্দঘন সময়ে খুব তাড়াতাড়ি বইগুলোর সাথে পরিচিত হতে হবে তোমাদের। প্রস্তুতি নিতে হবে লেখাপড়া শুরু করার। বছরটি হোক তোমাদের জন্য শুভময়।

বন্ধুরা, চলছে কনকনে শীত। শীতে পিঠাপুলি খেতে কার না পছন্দ। খেজুর রসের সেই গল্প আজ আমাদের কাছে গল্পই থেকে গেলো। মনে রাখবে, এ শীতে কিন্তু নিজে খুব দামি দামি জামা-কাপড় পড়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেই চলবে না। তোমাদের আশেপাশে অনেকেই শীত বস্ত্রের অভাবে কষ্টে দিনযাপন করছে। সাধ্যানুযায়ী তার হাতে তুলে দিতে হবে শীত বস্ত্র। প্রয়োজনে বন্ধুদের নিয়ে সম্মিলিতভাবে তৈরি করতে পারো শীতার্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর বিশেষ আয়োজন।

পরিশেষে বলতে চাই, শীতে নিজের যত্ন নেবে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে। আবারও কথা হবে আগামী মাসে। সে পর্যন্ত তোমাদের জন্য অনেক অনেক শুভ কামনা রইলো।

শুভেচ্ছাসহ
তোমাদেরই আন্দালিব ভাই

শব্দকল্প

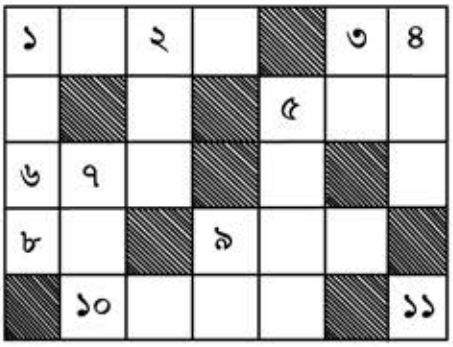

সূত্র : পাশাপাশি

১। মনুষ্য-প্রকৃতি ৩। গ্রীষ্মকালীন একটি ফল ৫। নামাযের আহ্বান ৬। চিন্তা-ভাবনা ৮। যে উদ্ভিদ অবলম্বনের জন্য অন্য কিছুকে জড়িয়ে বাড়ে, কুঞ্জ ৯। অকূল ১০। পৃথিবী, ধরণি ১১। একটি গাছের পাতা বিশেষ, যা দিয়ে কোমল পানীয় তৈরি হয়।

সূত্র : উপর-নীচ

১। সভা, সমাবেশ ২। নগর ৩। প্রতিদানের আরবি প্রতিশব্দ ৪। বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তা, ধী ৫। কুরআন মাজিদের ত্রিশতম পারা ৭। বই, পুস্তক ৯। জ্যোতিহীন

শব্দকল্পের সমাধান দাতাদের নাম আগামী সংখ্যায় ছাপা হবে

বর্ণকল্প

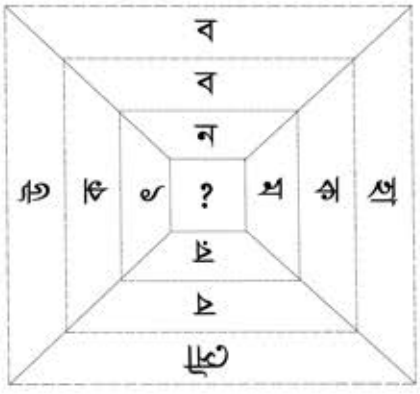

[বর্ণগুলো এলোমেলো আছে। এগুলো সাজিয়ে কেন্দ্রের ফাঁকা ঘরে একটি মাত্র বর্ণ বসালে চারটি অর্থবোধক শব্দ তৈরি হবে। চেষ্টা করে দেখতো অর্থসহ শব্দ চারটি তৈরি করতে পারো কি না! সঠিক উত্তরদাতাদের নাম আগামী সংখ্যায় ছাপা হবে।]

[আবাবীল ফৌজের বন্ধুরা! তোমরা যে কেউ পরিকল্পনা করে 'শব্দকল্প', 'বর্ণকল্প', অথবা শিক্ষামূলক 'ছোটগল্প' ও 'ছড়া/কবিতা' লিখে পাঠাতে পারো। অবশ্যই লেখা পাঠানোর ক্ষেত্রে নিচের নিয়মগুলো মেনে চলবে। আর মনে রাখবে, প্রত্যেক লেখার কপি রেখে পাঠাতে হবে, কারণ অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হয় না।]

নিয়মাবলি

- আবাবীল ফৌজের সদস্য হতে হলে নির্ধারিত সদস্য কুপনটি পূরণ করে ডাকযোগে অথবা ছবি তুলে ই-মেইলে পাঠাতে হবে।
- ইসলামী ভাবধারার যেকোনো উন্নত মানের শিশুতোষ রচনা এ বিভাগে ছাপা হয়। সর্বোপরি শিশু-কিশোরদের প্রতিভা বিকাশ, তাদেরকে ইসলামী মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করে সাংস্কৃতিক বিপ্লব সাধনের জন্যই 'আবাবীল ফৌজ'।
- লেখা সংক্ষিপ্ত হতে হবে। লেখার সাথে লেখকের পূর্ণ ঠিকানা থাকা চাই।
- বলতো দেখি, শব্দকল্প ও বর্ণকল্পের জবাব ও সমাধান চলতি মাসের ১৬ তারিখের মধ্যেই পত্রিকা অফিসে পৌছাতে হবে।
- 'বলতো দেখি'র সঠিক জবাবদাতাদের মধ্য থেকে নম্বরের ভিত্তিতে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান নির্ধারণ করে তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে।
- আবাবীল ফৌজের যেকোনো সদস্যের তৈরি করে পাঠানো শব্দকল্প, বর্ণকল্প মনোনীত ও প্রকাশিত হলে তাকে আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করা হবে।
- বর্ণকল্পে অংশগ্রহণকারী সঠিক জবাবদাতাদের নাম- ঠিকানা পরবর্তী সংখ্যায় যত্ন সহকারে ছাপানো হবে।
- A4 কাগজে স্পষ্ট করে হাতে লিখে অথবা কম্পোজ করে আবাবীল ফৌজের ঠিকানায় পাঠাতে হবে।
- ই-মেইলে লেখা পাঠানোর ক্ষেত্রে অবশ্যই আবাবীল ফৌজ ও লেখার শিরোনাম উল্লেখ করতে হবে।
- ই-মেইলের ক্ষেত্রে প্রতিটি লেখা স্বতন্ত্র ফাইল করে মেইলের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।
- প্রতিটি লেখার সাথে নিজের নাম, পূর্ণ ঠিকানা, যোগাযোগ নম্বর, শ্রেণি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম লিখে পাঠাতে হবে।

চিঠিপত্র

ঝরেপড়া শিক্ষার্থীরা কি স্কুলে ফিরবে?

করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে গত মার্চ মাসে দেশব্যাপী শুরু হয় লকডাউন। গরমকালে লকডাউন শিথিলতায় সচল হয় গণপরিবহন। অফিস, আদালত, ব্যাংকের কার্যক্রমও চলছে স্বাভাবিকভাবে। তবু খুলেনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ইতোমধ্যে বিশ্বজুড়ে শুরু হয়েছে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ। আবারও বাড়বে লকডাউন ও স্বাস্থ্যবিধির কড়াকড়ি।

দীর্ঘদিন পড়ালেখার ছোঁয়া থেকে দূরে থাকায় নিম্নবিত্ত পরিবারে অনেক শিশু-কিশোর কর্মসংস্থানের পথে হাঁটছেন।

কেউ অটো রিকশাচালক, রেস্টুরেন্ট ও দোকানের কর্মচারী, কেউবা শ্রমজীবী অভিভাবকের সহকর্মী। ভিন্ন পরিবেশে তারা অভ্যস্ত হচ্ছেন। দিন শেষে কিছু টাকা পাচ্ছেন। পরিবারের প্রতি কমছে নির্ভরশীলতা, নিজেরা হচ্ছেন স্বাবলম্বী। ফলে জুয়া ও নেশাদ্রব্য তাদের হাতের নাগালে। তাদের ভবিষ্যতের দর্পণ অস্বচ্ছ।

কাঁচা টাকা রোজগার করা শিশু-কিশোররা আবার কি স্কুলে ফিরবে? তাদেরকে পুনরায় স্কুলে ফেরাতে কোন পদক্ষেপ আছে কী? সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

বাবর হোসেন
ইলাবাজ, জকিগঞ্জ, সিলেট

সিলেট হতে পারে উন্নয়নের রোল মডেল

উন্নয়নের মহাসড়কে চলছে বাংলাদেশ। ইতোমধ্যে পদ্মার দুইপার সংযুক্ত করেছে স্বপ্নের পদ্মাসেতু। সারা দেশের মতো সিলেটেও চলছে উন্নয়ন কার্যক্রম। অবকাঠামো নির্মাণের পাশাপাশি সৌন্দর্য বর্ধনের দিকটি চোখে পড়ার মতো। রাস্তা প্রশস্তকরণ, ড্রেন নির্মাণ, সড়কবাতি ও চত্বর নির্মিত হচ্ছে।

শাহী ঈদগাহ, নয়াসড়ক, উপশহর পয়েন্টে নির্মিত হয়েছে দৃষ্টিনন্দন স্থাপনা। মূর্তি কিংবা ভাস্কর্য নয়, ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক বিবেচনায় এ সকল ফলকে নান্দনিক শিল্পকর্ম চিত্রিত হয়েছে। স্থানীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিবেচনায় বিভিন্ন জেলা শহরে নির্মিত হতে পারে এ ধরনের ফলক। এক্ষেত্রে সিলেট হতে পারে রোল মডেল।

মো. আবু বকর
শিক্ষার্থী; দক্ষিণ সুরমা ডিগ্রি কলেজ, সিলেট

পাঠকের প্রতি,

আপনার চারপাশের প্রয়োজনীয়তা ও সমস্যা নিয়ে অনধিক ২০০ শব্দে চিঠি লিখে chitipatra.parwana@gmail.com-এ পাঠিয়ে দিন।

...বিভাগীয় সম্পাদক

রঈসুল কুররা ওয়াল মুফাসসিরীন, উস্তাযুল মুহাদ্দিসীন, সুলতানুল আরিফীন
হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)-এর ঈসালে সাওয়াব ও
সপ্তাহব্যাপী বার্ষিক
খানকা মাহফিল ২০২১
৬ জানুয়ারী, বুধবার
বাদ মাগরিব হতে
১৩ জানুয়ারী, বুধবার
দিবাগত রাত পর্যন্ত
স্থান
ফুলতলী ছাহেব বাড়ী
জকিগঞ্জ, সিলেট
তা'লীম-তরবিয়ত প্রদান করবেন
হযরত আল্লামা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী
বড় ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী
ছাহেবজাদাগণ ও বিশিষ্ট উলামায়ে কিরাম
প্রতিদিন বিষয়ভিত্তিক বয়ান করবেন
বিরাদরানে তরীকতসহ সকলের দাওয়াত রইল
খানকা-ই-লতিফিয়া ফুলতলী